আগস্ট ১৯৯৩

মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

মুসলিম গণহত্যায়
কাদিয়ানীদের কালোহাত

বসনিয়ার মুসলমানদের আহবানঃ
খাদ্য নয় অস্ত্র চাই

তথাকথিত প্রগতিবাদ
পশুবাদেরই নামান্তর

থাই মুসলমানদের
অতীত ও বর্তমান

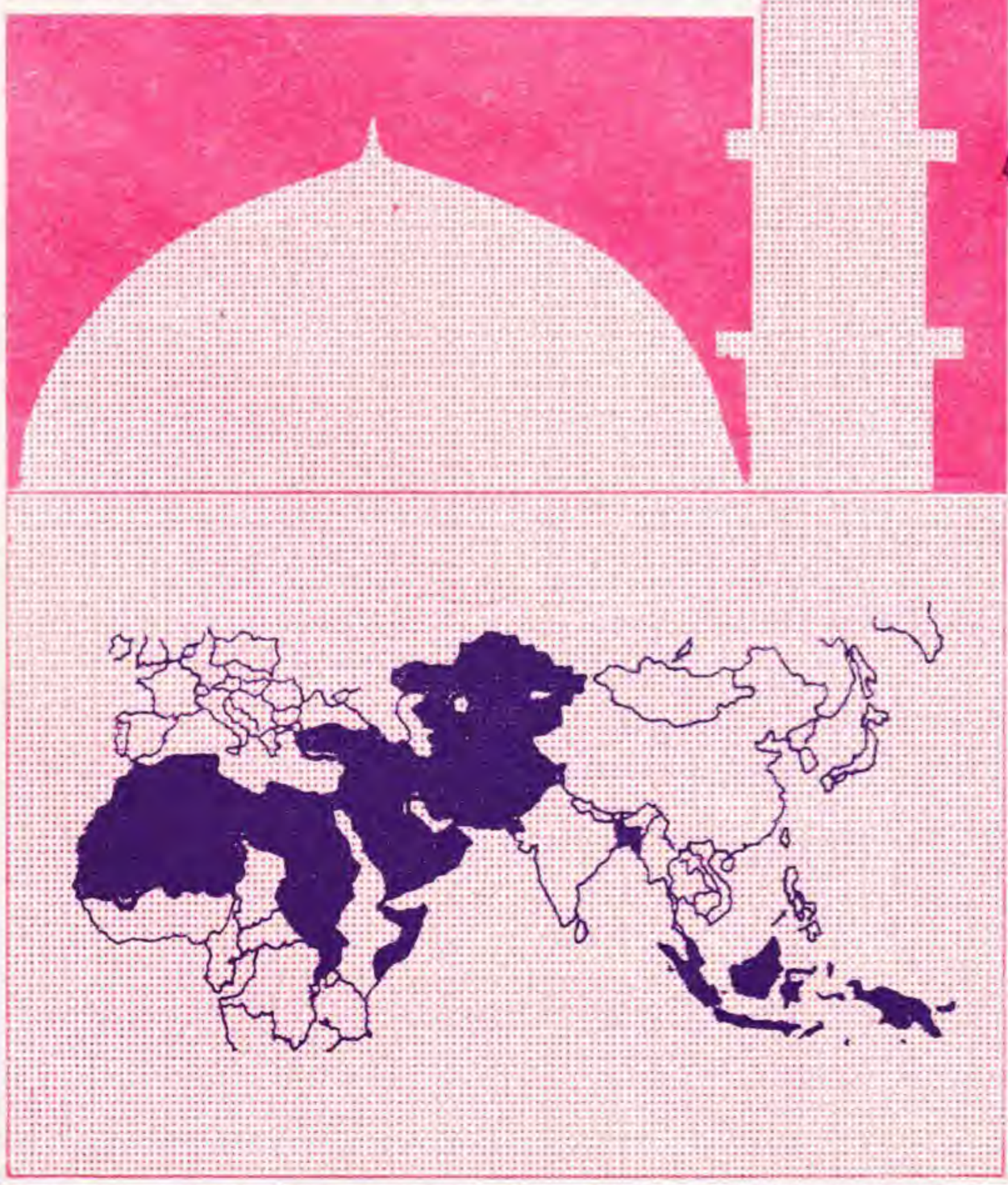

দু'টি চোখ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ করেছেনঃ

জাহান্নামের আগুন দু'টি
চোখকে স্পর্শ করবে না।
একটি হলো, যে চোখ
আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে।
দ্বিতীয়টি হলো যে চোখ
আল্লাহর রাস্তায় রাতভর
পাহারারত ছিল।

—তিরমিজী শরীফ

সৌজন্যেঃ

আল-ফারূক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা, দাওয়াত, প্রচার, প্রকাশনা
ও জনসেবামূলক ব্যতিক্রমধর্মী একটি প্রতিষ্ঠান
বি-৩৮১, খিলগাঁও, তালতলা, ঢাকা-১২১৯
ফোনঃ ৪১৮০৩৯

মাসিক

জাগো মুজাহিদ

MONTHLY JAGO MUJAHID

প্রতিষ্ঠাতাঃ
শহীদ কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারূকী (রাহঃ)

দ্বিতীয় বর্ষ ৯বম সংখ্যা
শ্রাবণ-১৪০০
সফর-১৪১৩
আগস্ট -১৯৯৩

পৃষ্ঠপোষকঃ
কমাণ্ডার মনজুর হাসান

সম্পাদকীয় উপদেষ্টাঃ
উবায়দুর রহমান খান নদভী

সম্পাদকঃ
মুফ্তী আব্দুল হাই

নির্বাহী সম্পাদকঃ
মনযূর আহমাদ

সহসম্পাদকঃ
হাবিবুর রহমান খান
মুফ্তী শফিকুর রহমান

মূল্য ঃ ৭ (সাত) টাকা মাত্র

যোগাযোগঃ
সম্পাদক জাগো মুজাহিদ
বি/৩৮১, খিলগাঁও,
তালতলা,
ঢাকা-১২১৯।

অথবা

জি, পি, ও বক্স নম্বরঃ ৩৭৭৩
ঢাকা-১০০০

সূচী পত্র

* পাঠকের কলাম ২
* সম্পাদকীয় ৩
* জীবন পাথেয়ঃ ইল্ম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা ও ফজিলত ৫
* বসনিয়ার মুসলমানদের আহবানঃ খাদ্য নয় অস্ত্র চাই ৭
* মুসলিম গণহত্যায় কাদিয়ানীদের কালো হাত
  ফজলুল করীম যশোরী ১০
* কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল
  আল্লাহ্‌র সাহায্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি ১২
* দেশে দেশে ইসলাম
  থাই মুসলমানদের অতীত ও বর্তমান
  নাসীম আরাফাত ১৫
* আমার দেশের চালচিত্রঃ
  তথাকথিত প্রগতিবাদ পশুবাদেরই নামান্তর
  মুহাম্মাদ ফারূক হুসাইন খান ১৮
* ইনসাফের আদালতে
  ইসলামে নিবেদিত নিপিড়ীত মানুষের ফরিয়াদ
  কাজী হাস্‌সান ২১
* আমরা যাদের উত্তরসূরী
  হাফেজ্জী হুযূর (রাহঃ)-এর স্মরণীয় বাণী
  সংকলনঃ হেদায়েত কবীর ২৪
* ধারাবাহিক উপন্যাস
  মরণজয়ী মুজাহিদ
  মল্লিক আহমাদ সরওয়ার ২৬
* কবিতা ২৯
* প্রশ্নোত্তর ৩০
* নবীন মুজাহিদদের পাতা ৩৪
* বিশ্বব্যাপী মুজাহিদদের তৎপরতা ৩৬

পাঠকের কলাম

বসনিয়ায় গমনোদ্যাগী বাংলাদেশী সৈনিক ভাইদের প্রতি–

সে দিন রাত ১১টার বাংলাদেশ রেডিওর খবর শুনছিলাম। এক পর্যায়ে শুনি, বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশের সেনা ও বিমান বাহিনী থেকে এক হাজার সৈন্য বসনিয়ায় প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খবরটা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এবং অন্তর থেকে দোয়া করতে লাগলাম।

হে আল্লাহ, ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের সল্প সংখ্যক মুসলমানকে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব নিকৃষ্ট পাষবিক নির্যাতন ও হত্যা লীলার শিকার আমাদের ঈমানী ভাই–বোন বসনিয়ার মুসলমানদের এই ঘোর দুর্দিনে তাদের সাহায্যার্থে ইউরোপের বুকে পাশ্চাত্যের নরপশুদের সামনে দাড়াবার সুযোগ করে দিয়েছো এজন্য তোমার দরবারে লাখো কোটিবার শুকরিয়া জানাই। আমার লজ্জাবতী ঈমানদীপ্ত মা–বোনদের আবরুর ওপর শত–সহস্রবার পাষবিক আঘাত হানার মুহূর্তে তাদের রক্ষা করার জন্য আমার কিছু ভাইকে সেখানে পৌছবার সুযোগ করে দিয়েছো এর জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই।

ব্যথা–ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হাত তুলে দোয়া করা ছাড়া অথবা দু–চার ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দেয়া ছাড়া আমাদের বাংলাদেশীদের তাদের পাশে দাড়ানোর কোন সুযোগ ছিলো না। শুধুই ভাবছিলাম, কোন সুযোগে দাড়াব চারি দিক থেকে আটকে পড়া ইউরোপের বসনীয় ভাই বোনদের পাশে গিয়ে। তৌফিক চাচ্ছিলাম পরওয়ার দিগারে আলমের নিকট। আল্লাহ্‌র রহমত, এজন্য আল্লাহ্ কবুল করেছেন দেশ রক্ষায় পবিত্র কুরআন নিয়ে শপথ করা আমাদেরই কিছু ভাইকে।

ভাইয়েরা! আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন, আমাদের বসনিয় মা–বোনদের রাত্রি–দিন যাপনের নিদারুণ সংকটময় করুণ অবস্থার কথা, প্রয়োজন সেখানে আমাদের সকলের যাওয়া। কিন্তু আমরা যে অপারগ। তাই আপনাদের নিকট হাতে জোড় অনুরোধ। আজই শপথ গ্রহণ করুন যে, প্রয়োজনে আমাদের রক্তের বিনিময়ে হলেও বসনিয়ার মা বোনসহ সকল মুসলমানদের স্ব–অবস্থানে, সঠিক ঠিকানায় ফিরিয়ে আনা ছাড়া আমরা বাংলাদেশে ফিরবো না। সকলে শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নামে জিহাদ করে যাব। আর এই জিহাদে যদি মৃত্যু হয় তাহলে হবো শহীদ, আর যদি ফিরে আসি তাহলে হবো গাজী। তাই বলছি, হয়তো শাহাদাৎ নয়তো বসনিয়ার আজাদী দুটোর একটা অবশ্যই। আপনাদের নিকট এই আমাদের প্রত্যাশা। কারণ আমরা অস্ত্রের হামলাটা আপনাদের উপরই ন্যাস্ত করলাম। মনে রাখবেন, আমি এবং আমার সমস্ত বাংলাদেশী ভাইসহ সারা পৃথিবীর মুসলমানদের সর্বক্ষণিক দোয়া অবশ্যই থাকবে আপনাদের সফলকাম হওয়ার জন্যে। জীবন বাজী রেখে হলেও দেশ রক্ষার মত মুসলমানদের ঈমান রক্ষার জন্য আপনাদের পবিত্র জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে একক সত্তা আল্লাহর নিকট শাহাদাতের সুধা পান করতে করতে কাল কিয়ামতের ময়দানে উঁচু শীরে দাড়াতে পারবেন। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ তাদের হৃদয়ে গেঁথে রাখবে আপনাদের নাম সোনালী হরফে। মানবতার উচ্চ আসনে হবে আপনাদের স্থান। মুক্তি পাগল মানবতা এখন মুক্তির আশায় দিগ হারা। সকল বাঁধার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ঐ পাগল জন মেজর–ক্লিনটনদের বুঝিয়ে দিতে হবে, বাংলাদেশের মুসলিম সৈনিকরা সত্যের পক্ষে অকাতরে রক্ত ঢেলে দিয়ে হযরত হুসাইন (আঃ)–এর মত এক নতুন কারবালা তৈরী করে দেখাতে পারে। কারণ, আপনারা স্ব–চক্ষেই দেখবেন, বসনীয় মুসলমানদের জন্য আমেরিকার পাঠানো ত্রাণ–সামগ্রীতে শুকর ও কুকুরের গোস্ত। কিভাবে ওরা কাটা ঘায়ে লবন ছিটাচ্ছে! দেখবেন, আফগান ও কাশ্মীরের মত নেমে আসা খোদায়ী সাহায্য আজও চৌদ্দশ বছর পূর্বের বদর কায়েম করতে পারে, আপনাদের প্রত্যেক কদমে কদমে থাকবে আল্লাহর গায়েবী নুসরাত। আল্লাহুম্মা আইজ্জিল ইসলামা ওয়াল মুসলিমীন। আমীন।

আপনাদের এক ভাই,
এম, গিয়াস।

সুসংবাদ! সুসংবাদ!! সুসংবাদ!!!

রেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ (বাংলাদেশ কওমী মাদ্রসা শিক্ষা বোর্ড) এর পক্ষ হতে ইসলামী আদর্শ মূল্যবোধের ভিত্তিতে বেফাকের প্রাইমারীর সকল বিষয়ের বই পুস্তক প্রনয়ন ও প্রকাশ করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং শীঘ্রই কওমী পাবলিকেশন্‌স এর মাধ্যমে উহা প্রকাশ ও বাজারজাত করা হচ্ছে–ইন্‌শাল্লাহ্।

অতএব সকল কওমী মাদ্রাসায় অত্র বই পুস্তক সমূহ পাঠ্য করার জন্য এবং অন্যান্য বই পাঠ্য না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(মাওলানা) আবদুল জব্বার
সাধারণ সম্পাদক
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া
বাংলাদেশ।

বিঃ দ্রঃ সার্বিক যোগাযোগঃ কওমী পাবলিকেশন্‌স
১৫৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক, এলাকা, ঢাকা–১০০০

সম্পাদকীয়

জীবনের চেয়ে শাহাদাত প্রিয় এমন একদল মুজাহিদের আজ একান্ত প্রয়োজন

এই মুহূর্তে আঘাতের পর আঘাতে ক্ষত–বিক্ষত হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের দেহখানা। ক্ষত নিঃসৃত হাজারো রক্ত স্রোত ধারা সৃষ্টি করছে রক্ত সাগর মহা সাগরের। আজ ইসলামের সকল দুশমনেরা একজোট হয়ে মুসলিম জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়াকেই একমাত্র টার্গেট নিরূপন করেছে। তাই ওরা মুসলিম নিধন অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে নিরুদ্বেগ, বাধাহীন গতিতে।

খৃষ্টান ধর্মের ব্রাণ্ড 'ক্রুস' নামাঙ্কিত মিজাইলের আঘাতে তড়পাচ্ছে ঘুমন্ত মজলুম ইরাকবাসী। শান্তির ক্যানবাসারদের প্রত্যক্ষ মদদে বর্বর সার্ব ক্রোটদের বুলেটের আঘাতে চিরতরে শান্তহয়ে যাচ্ছে বসনীয় মুসলমানরা। ক্ষুধার্থ সোমালী মুসলমানরা জাতিসংঘ ঘোষিত ক্রুসেডের মোকাবিলা করছে। ক্রুসেড পরিচালক বুট্রোস ঘালির লাঠিয়াল বাহিনী প্রতিদিন সোমালীদের খুন ঝরাচ্ছে বেশ আয়েশ করেই।

কাপালিক ব্রাহ্মণ ও উগ্র বুদ্ধিষ্ট বাহিনীর হাতে রক্ত ঝরছে কাশ্মীর, ভারত ও আরাকানে। খৃষ্টান ফিলিপিনো সরকার ফিলিপাইন ও মিন্দানওয়ের মুসলমানদের অস্তিত্ব সহ্য করতে নারাজ। সামরিক জান্তা মুসলিম নিধনে এখনোও পিছিয়ে নেই। খৃষ্টান আর্মেনিয়া আগ্রাসন চালাচ্ছে মুসলিম আজারবাইজানে। দাম্ভিক রাশিয়া আর একবার আফগান ভূমে আগ্রাসন চালাবার তোরজোর করছে। তাজিক সীমান্তে ইতিমধ্যে তার লোক লস্কর ১৯৭৯ সালের খোয়াব দেখছে।

রক্ত ঝরছে ফিলিস্তিনে। মুসলিম ছদ্মবেশী ইসলামের দুশমনদের রোষাণলে পড়ে শাহাদাৎ লাভকারী আলজেরীয় মিশরীয় ও লিবীয় মুসলমানের সংখ্যাও কম নয়।

ইসলামের দুশমনদের রোষাণল থেকে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি খানাও নিরাপদ নয়। ওরা কাদিয়ানী ফিতনা উস্কে দিয়ে, মিশনারী ও এনজিওর মাধ্যমে নিরবে আমাদের ঈমান–আকিদার ওপর ছোবল হানছে—সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গণে অবৈধ হস্তক্ষেপ করে দেশের স্থিতিশিলতা ধ্বংসের পায়তারা চালাচ্ছে।

কিন্তু কেন আমাদের এই অধঃপতন, এত দুর্দশা? কেন লাখো লাখো মুসলমান মজলুম হয়ে হাহাকার করে ফিরছে? কেন মুসলমানদের এত খুন ঝরাতে হবে, এত মার খেতে হবে?

ইসলাম শান্তির ধর্ম। দুনিয়ায় শান্তি স্থাপন এবং বন্দী মানবতাকে মুক্ত করতেই ইসলামের অভ্যুদয়। আর এই মিশন নিয়েই সেকালের সত্যান্বষী দৃঢ়মনবল চেতা আরবরা দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। রোম, পারাস্য ও স্পেনের সম্রাটত্রয়ের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে বিশ্বে স্থাপন করেছিলেন শান্তি ও মানবতার অনুপম আদর্শ ও নজীরবিহীন ইতিহাস।

কিন্তু আপসোস, সেদিনের কায়সার ও কিসরার দাম্ভিক সম্রাটদের উত্তর পুরুষ ক্লিনটন, মেজর ও মিতেরারা আজ শান্তির বার্তাবাহকদের ওপর একের পর এক আঘাত হেনেই যাচ্ছে। কিন্তু হেজাজের কোন কাফেলা তৈরি হয়নি এর যোগ্য জবাব দানে।

কুফুরি ও জালিম শক্তি আজ মহা শক্তিধর। জালিমের ঔদ্ধত্ব ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। মজলূমের কাফেলার কলেবর তেমনি ভারী হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অথচ বিশ্বে শান্তি ও মানবতার হেফাজতের দায়িত্ব প্রাপ্ত মানুষেরাও বিপুল সংখ্যক বিদ্যমান।

জালিমের সাথে শান্তির সৈনিকদের টক্কর চিরন্তন। যুগে যুগে জালিম যতই শক্তিমান হোক সত্যের সেবকদের দৃঢ়তায় তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। তদ্রুপ আজও জালিম মার্কিনীদের মিসাইলের আঘাতে সত্যাশ্রয়ী ইরাকীরা নয়, সত্যের সৈনিকদের বাগদাদ থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইলের আঘাতে জালিমের প্রসাদ ধ্বংস হওয়াটাই ছিল ইতিহাসের দাবি। মোগাদিসু, রিয়াদ, কুয়েত সিটি, বাহরাইন, মোসুলে কাফির শক্তির সেনা সমাবেশ নয় বরং এসব এলাকার মুজাহিদ কাফেলার এতোদিনে জালিমদের আড্ডাখানা লণ্ডন, ওয়াশিংটন, মস্কো, প্যারিস, দিল্লী অবরোধ করাটাই ছিল স্বাভাবিক। যেমনি অবরোধ করেছিল মরুচারী বেদুইনরা পারস্য ও রোম সম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েন ও কনস্টানটিনোপোল। মজলুম নয় আজ নব্য ফেরাউন ক্লিনটন, মেজর, কোহল, মিতেরা, নরসিমা ও ইয়েলৎসিনরাই, সত্যের সৈনিকদের ভয়ে চম্পমান হতো।

এ ব্যর্থতা আমাদের। আমরা ইসলামের আদর্শ থেকে বহু যোজন দূরে অবস্থান নিয়েছি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি, দর্শন ও রাজনীতি চর্চা করে আমরা বহুত আধুনিক বনে গেছি। সভ্যতার ঝলমলে লেবাস শরীরে চাপিয়েছি। কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও রাজনীতিবীদও মুসলিম বিশ্বে এ সময় কম জন্ম নেননি। কিন্তু জালিমের ধ্বংসকারী ও মানবতার হেফাজতকারী কোন অকুতোভয় মুজাহিদদের কাফেলা আমরা তৈরি করতে পারিনি। তাই এসময় থেকেই বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে, আমরা বিশ্ব শান্তি রক্ষাতো দূরের কথা নিজেদের জালিমের হাত থেকে রক্ষা করতেও অক্ষম। অশিক্ষিত মেষপালক আরব বেদুঈনরা ইসলামের ছায়াতলে এসে যে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় রেখে শান্তি ও কল্যাণময় বিশ্ব গড়েছিল আমরা তার হাজার ভাগের একভাগতও প্রদর্শন করতে সক্ষম নই।

আমাদের এ ব্যর্থতার একমাত্র দাওয়াই 'ইসলাম'। ইসলামকে রক্ষার জন্য নয় বরং ইসলামকে আকড়ে ধরে বিশ্ব মানবতাকে হেফাজতের দায়িত্ব পালনে এখন প্রয়োজন একদল নির্ভীক মুজাহিদের। জীবনের ন্যায় শাহাদাৎ প্রিয় হবে এমন মনোবলের মুজাহিদের আজ বড় প্রয়োজন।

এ কথা আজ প্রমাণিত সত্য যে, শুধু শিল্প–সাহিত্য, সংস্কৃতি ও তথাকথিত রাজনীতি চর্চা করে মুসলিম বিশ্বের অধপতন রোধ করা সম্ভব নয়। এর সাথে ইসলামের তলোয়ারের শক্তিকেও সমন্বিত করতে হবে। জালিমের ঔদ্ধত্ব চূর্ণ করে মাথা উঁচু করে দাড়াতে হলে পুনঃরায় তলোয়ার কোষমুক্ত না করে মাসলমানদের আর গত্যান্তর নেই।

মাসিক জাগো মুজাহিদের অফিস স্থানান্তর

ঠিকানা পরিবর্তন

~~পূর্বের ঠিকানা~~

~~মাসিক জাগো মুজাহিদ~~
~~বি-৪৩৯, খিলগাঁও,~~
~~তালতলা, ঢাকা-১২১৯~~

বর্তমান ঠিকানা

মাসিক জাগো মুজাহিদ
বি-৩৮১, খিলগাঁও,
তালতলা, ঢাকা--১২১৯

'জাগো মুজাহিদ'-এর নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়
- এজেন্সীর জন্য অগ্রীম বা জামানত পাঠাতে হয় না।
- অর্ডার পেলেই পত্রিকা ভিপিতে পাঠানো হয়।
- যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়
- অবিক্রিত কপি ফেরৎ নেয়া হয় না।
- ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

ব্যাংক একাউন্ড

মাসিক জাগো মুজাহিদ
কারেন্ট একাউন্ড নং-৫৩১৯
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
লোকাল ব্রাঞ্চ, মতিঝিল, ঢাকা

২. বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিষ্ট্রি ডাক)

বাংলাদেশ	একশো চল্লিশ টাকা
ভারত ও নেপাল	ছয় ডলার
পাকিস্তান	আট ডলার
মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা	পনের ডলার
মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	পনের ডলার
ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া	আঠার ডলার

সাধারণ ডাকে গ্রাহক করা হয় না।

৩. গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- গ্রাহক হবার জন্য ব্যাংক ড্রাফট ও চেক 'মাসিক জাগো মুজাহিদ' নামে পাঠাতে হয়। দেশের অভ্যন্তর থেকে মানি অর্ডার পাঠাতে হবে নিম্নের যোগাযোগের ঠিকানায়

সব রকম যোগাযোগের ঠিকানা

মাসিক জাগো মুজাহিদ
বি-৩৮১, খিলগাঁও,
তালতলা, ঢাকা-১২১৯

ইল্‌ম অর্জনের গুরুত্ব ও আবশ্যকীয়তা

বশীর আহমাদ হানাফী

ইল্‌মের ফজীলত সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর কালামে মাজিদে ইরশাদ করেছেন যে, যারা ঈমান এনেছে বিশেষত যারা ইল্‌ম হাসীল করেছে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উচ্চাসনের অধিকারী করবেন।

ইল্‌ম অর্থ জ্ঞান হলেও সবধরনের জ্ঞানকে ইল্‌ম বলা যাবে না। ইল্‌ম আল্লাহ পাকের ভয় ও ভক্তির বাহক ও উছিলা হয় এবং যাদ্বারা মানুষের মনে আল্লাহ্ পাকের ভয় ও ভক্তির উদ্রেক হয় তাকেই প্রকৃত ইল্‌ম বা জ্ঞান বলা হয়। যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্ পাককে চিনা যায় না সে জ্ঞান অর্জনকারীরা যখন পরকালে দোজখবাসী হবে তখন দুঃখ ও অনুতাপ করে বলবে, "হায় যদি আমরা অন্যের থেকে দ্বীনের ইল্‌ম অর্জন করতাম তা হলে আজ আমরা দোজখ বাসী হতাম না।" (আল কুরআনঃ সূরা মূলক)

ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, "প্রত্যেক নর-নারীর জন্য দ্বীন ইল্‌ম অর্জন করা ফরজ-অবশ্য কর্তব্য।" যেমন নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের ফরয ওয়াজিব বিষয়গুলো প্রত্যেকের জানা ফরয। এমনিভাবে পর্দা একটি ফরজে দায়েম। এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান বালেগ পুরুষ ও নারীর ওপর ফরজ। ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিরূপে ব্যবসা করবে সে জ্ঞান বা ইল্‌ম তার জানা থাকা দরকার। কেননা কোন মাল বেচাকেনা করার অনুমতি শরিয়তে আছে, কোনটার নেই সে জ্ঞান অর্জন করার পরই ব্যবসায় অবতীর্ণ হতে হয় ইত্যাদি।

তাই রাসূল (সাঃ) আলেমগণের ফজীলত সম্পর্কে ইরশাদ করেন, "আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী। এই দুনিয়ায় নবীগণের ত্যাজ্য সম্পত্তি একমাত্র ইল্‌ম। যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষা করেছেন সে অতি মূল্যবান সম্পদ লাভ করেছেন।

দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করার গুরুত্ব সাহাবা ও তাবেয়ীদের মধ্যে কি পরিমাণ ছিল তা' হাদীসের একটি ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়- এক ব্যক্তি মদীনা শরীফ থেকে ছয়শত মাইল পথ অতিক্রম করে দামেস্ক শহরের সফর করেছিলেন মাত্র একখানা হাদীস শ্রবণ করার জন্য। ওই ব্যক্তি দামেস্ক পৌছে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বলেছিলেন, হে আবু দারদা (রাঃ) আমি আপনার নিকট একটি হাদীস শ্রবণ করার জন্য এসেছি যে হাদীস খানা আপনি হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করে থাকেন। আর আমার এই সফর শুধু এ জন্যই তাঁর কথার প্রতি উত্তরে হযরত আবু দরদা (রাঃ) বলে ছিলেন, "যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য সফর করবে আল্লাহ পাক তার জন্য বেহেস্তের পথ সহজ ও সুগম করে দিবেন।" তিনি আরও বলেছিলেন, "নিশ্চয় জেনে নাও যে, দ্বীনের জ্ঞান আহরণকারী তালীবে ইল্‌মের জন্য স্বীয় পালক সমূহ ছিনিয়ে দিয়ে তাদের সম্মান করে থাকেন, ফেরেস্তারা সার্বক্ষণিকভাবে তালীবে ইল্‌মের খিদমতে রত থাকনে।" তিনি আরও বলেন যে, "সাত আসমান ও জমীনের ওপর যা কিছু বাস করে এমন কি পানির মধ্যে বসবাসকারী মৎস্য জাতীয় জীবেরাও তালীবে ইল্‌ম বা আলেমের মুক্তির জন্য দুআ মাগফেরাত করতে থাকে।"

বোখারী শরীফের এক খানা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, "মানুষের জন্যে প্রতিযোগিতা করে হাসীল করার বিষয় মাত্র দু'টি, একটি হল সাখাওয়াত বা দানশীলতা, দ্বিতীয়টি হল হিকমত বা সত্যিকারের ধর্ম জ্ঞান।"

দারেমীতে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তির ইলম হাসিল করা অবস্থায় মৃত্যু হয় আর তার ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্য এক মাত্র (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য) ইসলামের প্রচার প্রসার হয় এমতাবস্থায় ইলম হাসিলকারী ব্যক্তি এবং নবীগণের মাঝে মাত্র একটি দরজার ব্যবধান থাকে।" দারেমীর আরও একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একজন আলেম এবং একজন আবেদের মধ্যে একশত দরজা ব্যবধান থাকবে। আর এক দরজা হতে আরেক দরজার দূরত্ব এত লম্বা হবে যে, দ্রুতগামী ঘোড়া সত্তর বছর বিরামহীন দৌড়ানোর পর সেখানে পৌছতে সক্ষম হবে।" আরও একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, "কিয়ামতের ময়দানে তিন প্রকারের লোক সুপারিশ করার অধিকার পাবে। নবী, আলিমগণ ও শহীদগণ।" হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সামনে তিনটি বিষয় উপস্থাপন করে তাঁকে যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দিয়েছিলেন। বিষয় তিনটি হল ইল্‌ম, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও সম্পদ। হযরত সোলায়মান (আঃ) এ থেকে ইল্‌ম গ্রহণ

করে ছিলেন। এর ফলে আল্লাহ্ পাক খুশি হয়ে তাঁকে তিনটিই দান করেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, "সাত কারণে ইল্‌ম সম্পদ থেকে উত্তম। (১) ইল্‌ম নবীগণের ত্যাজ্য সম্পদ আর মাল ফেরাউনি সম্পদ (২) ইল্‌ম বিতরণ করার দ্বারা কমে না বরং বৃদ্ধিপায় আর মাল বিতরণের দ্বারা কমে যায় (৩) মাল হেফাজতের জন্য পাহারাদারের প্রয়োজন হয় আর ইল্‌ম খোদ হেফাজতকারী হয় যে তাকে অর্জন করে (৪) মানুষ মরে যাওয়ার পর সম্পদ তার সাথে যায় না। বরং জমীনের ওপর থেকে যায়। আর ইল্‌ম আলিমের সাথে কবরে প্রবেশ করে (৫) সম্পদ অর্জন করে ইমানদার ও বেঈমানদার উভয়ে কিন্তু ইল্‌ম অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করে কেবল ঈমানদার ব্যক্তি (৬) দুনিয়ার মালদারেরা দ্বীনি বিষয়ে আলেমগণের মুখাপেক্ষী থাকে কিন্তু আলেমগণ মালদারদের নিকট মুখাপেক্ষী নন। (৭) ইল্‌ম মানুষকে সরল ও সোজা পথে চলার শক্তি যোগায় আর সম্পদ সর্বদা মানুষকে বক্র পথে পরিচালিত করে।"

ইল্‌মে দ্বীনের কি দরকার ও তা অর্জনকারী নায়েবে নবীগণের কি সম্মান ও কদর হযরত আলী (রাঃ)-এর কথা দ্বারা তা বুঝা যায়। দুনিয়াতে সঠিক পথ পেতে হলে ইল্‌মে দ্বীনের কত প্রয়োজন একটু চিন্তা করলে আমরাও বুঝতে পারব। আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দ্বীনের শিক্ষা না থাকায় কি ঘটছে তা' সবারই জানা। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইল্‌মে দ্বীনের শিক্ষা ও চর্চা না থাকায় তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার (যা অসভ্যের চরম) আবহে অধিকাংশ শিক্ষিতরা বিপথগামী হচ্ছেন। যেমন পর্দা করা মুসলিম মহিলাদের জন্য আল্লাহর হুকুম কিন্তু আজ বিশ্ব মুসলিমের অবস্থা কি দাড়িয়েছে। পর্দা পালন তো দূরের কথা বরং একে মধ্য যুগীয় প্রথা বলে উপহাস করছে। আমার দেশের মুসলিম যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী, ভাই বোনদের নিকট আকুল আবেদন, আসুন আমরা ইল্‌মে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের প্রতিটি ঘরে দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দেই। সাথে সাথে আমরা সকলে নবীগণের যোগ্য ওয়ারিস হওয়ার গৌরব অর্জণ করি এবং পরকালে বেহেশতের সর্ব উচ্চাসন জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী হই। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে দ্বীনী ইল্‌ম অর্জন করার তওফীক দান করুন।

হাঁপানি বাত প্যারালাইসিস চর্মরোগ এ্যালার্জি

- গ্যাস্টিক, আলসার, গলা ও বুকজ্বালা, লিভারদোষ, রক্ত আমাশয়, পুরাতন আমের দোষ।
- প্রস্রাবে ক্ষয়, ঘনঘন প্রস্রাব, (ডায়াবেটিস), প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া, কিটকিট কামড় মারা
- স্বপ্ন দোষ, শ্রক্র তারল্য, পুরুষত্বহীনতা, লিঙ্গে দোষ।
- সিফিলিস, গনোরিয়া, প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া রক্ত পুঁজ যাওয়া, ধ্বজভঙ্গ।

স্ত্রী ব্যাধি

- শ্বেত পদর (লিকুরিয়া), রক্ত প্রদ, বাধক বেদনা, যে কোন কারণে মাসিক বন্ধ, সুতিকা, শুকনা সুতি, নারিত্বহীনতা, ১০/১৫ বৎসর বিবাহ হয়েছে আজও সন্তান হয় নাই তাদের সন্তান লাভ।
- অর্শ, গেজ, ভগন্দর, শ্বেতী, সুলী, ব্রন, মেস্তা, কানপাঁকা, কানে কম শোনা, চক্ষুরোগ, মস্তিষ্কের দুর্বলতা, মৃগী, পাগল, অকাল চুল পাকা ও উঠা ইত্যাদিতে নিশ্চয়তা।

উপরে বর্ণিত রোগে যারা আক্রান্ত তাদের সেবা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রথম শ্রেণীর হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিনের সহিত নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগঃ

হাকিম হাফেজ মেছবাহ উদ্দিন

গওহার ইউনানী ঔষধালয়

সেকশন-১২, ব্লক ডি (পানির ট্যাংকি সংলগ্ন) মিরপুর, ঢাকা-১২১২২

বসনিয়ার মুসলমানদের আহ্বানঃ খাদ্য নয় অস্ত্র চাই

কমাণ্ডার আবু আব্দুল আজীজ বর্তমানে বসনিয়ার মজলুম মুসলমানদের সাহায্যার্থে জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় লিপ্ত একজন মুজাহিদ কমাণ্ডার। এর আগে তিনি আফগানিস্তানে রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। ইসলামের দুশমনরা তার নাম শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ত। বর্তমানে সার্ব শয়তানদের কাছে তিনি সাক্ষাৎ মৃত্যু দূত হিসেবে বিবেচিত। বসনিয়ার রণাঙ্গণে এই বীর কেশরীর দীপ্ত পদচারণায় সার্ব যোদ্ধাদের চোখের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তারা এই মুজাহিদ কমাণ্ডারের রক্তপিপাসু হয়েছে এবং তাঁকে ধরার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই বীর মুজাহিদের বীরত্ব ও জিহাদী জজবার কাহিনী আজ বসনিয়ার সর্বত্র মুখরোচক আলোচনার খোরাকে পরিণত হয়েছে। তিনি কোন দেশের নাগরিক তা জানা সম্ভব হয়নি। কেননা, তিনি সর্বত্র এই পরিচয় দেন যে, আমার দেশ মুসলিম অধ্যুষিত এবং আমার পরিচয় মুসলমান, আমার জন্য কোন ভৌগোলিক সীমারেখা গুরুত্ব রাখে না।

সম্প্রতি তিনি বসনীয় মুসলমানদের দুর্দশা বিশ্ব মুসলমানদের জানানোর জন্য এবং তাদের এই মজলুমদের পাশে দাঁড়ানোর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন মুসলিমদেশ সফরে বের হয়েছেন। এ সময় তিনি বিখ্যাত আরবী দৈনিক 'আশ-শকর-এর' সাথে এক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। আমরা এখানে তার অনুবাদ তুলে ধরছিঃ

প্রশ্নঃ আপনার দেশ কোথায় এবং বসনিয়ায় কিভাবে গেলেন? বর্তমানে সেখানে কি করছেন?

উত্তরঃ সর্ব প্রথমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের শোকর এবং নবী করিম (সাঃ)-এর ওপর দরুদ ও সালাম। আমার পরিচয় আমি মুসলমান। এর ওপর কোন ভৌগোলিক বা ভাষাগত জাতীয়তায় আমি সীমাবদ্ধ হতে রাজি নই। আবু আব্দুল আজীজ নামেই আমি পরিচিত। (গোপনীয়তার স্বার্থে আসল নাম প্রকাশ করা হয়নি) বয়স ৫০ বছর। বিবাহিত এবং আলহামদুলিল্লাহ, নয় সন্তানের জনক।

আমার দেশ ইসলামী জগত এবং এটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে আল্লাহু আকবর আওয়াজ জারী হবে সেখানেই আমার মনের অবস্থান। আর মজলুম মুসলমানরা আমার দেহের অংশ। তাদের সমস্যাই আমার সমস্যা। আমার জন্য দুর্বল মুসলমানদের সাহায্য করা ফরজ। অতএব যেখানেই প্রয়োজন হয় আমি তাদের সাহায্যের জন্য পৌঁছে যেতে চেষ্টা করি। ১৯৯২ সালে ঈদুল ফিতরের পর যখন বসনিয়ার মুসলমানদের করুণ অবস্থা পত্র-পত্রিকায় আসতে শুরু করে তখন থেকেই সেই ব্যাপারে তথ্য সগ্রহ করতে শুরু করি। প্রথমে মনে করেছিলাম যে, এই দেশ আ মেরিকার দক্ষিণে কোথাও হবে। পরে জানলাম, এটি প্রধানত যুগোশ্লাভিয়ার অংশ। এরপর বসনিয়ার ইতিহাস, ভূগোল বিষয়ক তত্ত্ব সংগ্রহ করে জানতে পারলাম যে, এ বসনিয়া সাবেক ওসমানীয়া খেলাফতের অংশ। কয়েকশ' বছর যাবৎ এ দেশে মুসলিম শাসন চলেছে। ইউরোপের অংশ হয়েও সেখানকার কৃষ্টি, কালচার সবকিছুই মুসলমানদের অনুরূপ ছিল। পরবর্তীকালে সার্বীয়ানরা এদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সমগ্র বসনিয়াকে দখল করে নেয়। ইসলাম এবং মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার জন্য তারা কোন প্রচেষ্টাই বাদ দেয়নি। এদের কৃষ্টি, কালচার পরিবর্তন করেছে; আচার-আচরণ, আদব-কায়দাকে পাল্টে দিয়ে সার্বিকভাবে ইউরোপীয়ান বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এরপরও মানসিকভাবে তারা মুসলমানই থেকে গেছে। সার্বদের হাজারো অপচেষ্টাও তাদের ঈমানকে ধ্বংস করতে পারেনি

আফগান জিহাদ দুনিয়ার মজলুম জনগোষ্ঠীর নিকট কমুনিজমের মুখোশ খুলে দেয়। দিকে দিকে রাশিয়ার মাতুব্বারির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। রুশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় এবং এর প্রভাবে যুগোশ্লাভিয়াও ভেঙ্গে ছয় টুকরোয় পরিণত হয়। জন্ম নেয় বসনিয়া-হার্জেগোভিনা নামে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রটির।

প্রশ্নঃ বহিরাগতভাবে আপনি কি একা বসনিয়ায় জিহাদ করছেন? সেখানে আপনার অবস্থান সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।

উত্তরঃ আমার সাথে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণকারী কিছু বহিরাগত মুজাহিদও বসনিয়ায় গিয়েছেন। তাঁদের সাথে নিয়ে প্রথমে আমরা বসনিয়ায় যুবকদের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর দাওয়াত ও ট্রেনিং দেই। বসনিয়ার বর্তমান অবস্থা খুবই করুন। সেখানের জুলুম নির্যাতনের খবর পত্র-পত্রিকায় শত ভাগের এক ভাগও প্রকাশিত হয় না। সার্বরা বসনীয় মুসলিম শিশুদের মায়ের সামনেই জবাই করে জীবিত শিশুদের অঙ্গ দেহে থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায়। ছেলের সামনে মায়ের, ভাইয়ের সামনে বোনের, স্বামীর সামনে স্ত্রীর ইজ্জত হরণ করে। যুবকদের প্রকাশ্যে জবাই করে, কাউকেবা জীবন্ত দাফন দিয়ে দেয়। জনসাধারণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য বন্দী মুসলমানদের রশি দিয়ে গাড়ির পেছনে বেঁধে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু এত নির্যাতনের পরও মুসলমানরা জিহাদ

অব্যাহত রেখেছে, তারা ভীত হওয়ার বদলে দিন দিন ঈমানী জজবায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

প্রশ্নঃ আপনি সেখানে কীভাবে জিহাদী তৎপরতা শুরু করলেন?

উত্তরঃ প্রথমে আমরা বসনীয়দের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি। আমাদের প্রধান সমস্যা ছিল বসনিয়ার লোকদের দ্বীন সম্পর্কে তেমন স্বচ্ছ ধারণা না থাকা। তারা ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে কিছুই জানত না। জিহাদ বা ইসলামে শাহাদাতের যে সীমাহীন মর্যাদা রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। আলহামদুলিল্লাহ, আফগান থেকে আসা মুজাহিদদের চেষ্টার ফলে তারা ইসলাম ও জিহাদ সম্পর্কে জেনেছে। শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্খায় তারা সার্ব আগ্রাসনের মোকাবিলা করে অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর জন্ম দিচ্ছে।

ধর্ম সম্পর্কে তাদের এই অজ্ঞতার জন্য তাদের কোন দোষ দেয়া যায় না। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবৎ কমুনিষ্ট শাসনের ফলে তারা ধর্ম সম্পর্কে কোন শিক্ষা লাভ করতে পারেনি। তখন অবস্থা এমন ছিল যে, কোন বাপ যদি তার মেয়েকে অমুসলমানদের সাথে মিশতে নিষেধ করতো তবে প্রশাসন তাকে যুগোশ্লাভীয় ঐক্যের বিরোধী তৎপরতা এবং সাম্প্রদায়িক আচরণের অভিযোগ জেলে পাঠাত। বাপ তার ছেলেকে মদ খেতে নিষেধ করলে দণ্ড পেতে হতো। এজন্য আমাদের একই সাথে কয়েক ময়দানে লড়তে হয়েছে। একদিকে বসনিয়দের ধর্মীয় শিক্ষা ও জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা এবং অন্যদিকে সার্বদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই।

প্রশ্নঃ কোন সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন কি?

উত্তরঃ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চেষ্টা সাধনার সুফল ফলেছে। বসনীয় মুসলমানরা সার্বদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ এবং তা মনে চলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছে। আমরা তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে পেরেছি। অন্যদিকে সামাজিক বিজয়ও অর্জন করেছি। সার্বদের সাথে আমাদের বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটেছে তাতে আমরা সার্বদের পরাস্ত করেছি। যুদ্ধে আমাদের আটজন বহিরাগত মুজাহিদ শহীদ হন। অন্য এক লড়াইয়ে শহীদ হন তিনজন। বর্তমানে আমরা এখানে নিয়মিত মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তুলেছি। বহিরাগত মুজাহিদরা বিনা জাতিভেদে সকলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই কমাণ্ডের অধীনে লড়াই করে যাচ্ছে। আমাদের অবস্থান স্থানীয় মুসলমানদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রশ্নঃ মুসলিম ফৌজদের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে?

উত্তরঃ মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর বর্তমান সেনানায়ক মাহমুদ কারমেশ। তিনি মদীনা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বসনিয়ার এক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং এর পাশাপাশি সারাজেভোর এক মসজিদেরও ইমামতি করতেন। এই কমাণ্ডের অধীনে অনেক ব্যাটালিয়ান রয়েছে। প্রতি ব্যাটালিয়ান এক থেকে দেড়শ মুজাহিদ নিয়ে গঠিত। এদের মধ্য থেকে মিলিটারী পুলিশ বানিহীও গঠন করা হয়েছে। এরা মুজাহিদদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কেউ ধর্মীয় রীতি-নীতির পরিপন্থী কাজ করলে তাদের কঠোর শাস্তি দেয়। এই বাহিনী বসনিয়ার মুসলমানদের মন জয় করেছে এবং তাদের সকল আশা-আকাঙ্খা এদের ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেছে।

প্রশ্নঃ আপনাদের একটি কঠিনতম লড়াই সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।

উত্তরঃ সবচেয়ে কঠিনতম লড়াই হয়েছে জেকো শহরে। এই লড়াইয়ে প্রায় পাঁচ হাজার মুজাহিদ অংশ নেয়। আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সুদৃঢ় প্রতিরক্ষার ফলে সার্বরা পরাজিত হয়। সারাজেভো শহর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার তাদের আকাঙ্খা সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ হয় এই পরাজয়ে। এই যুদ্ধে দুশো সার্ব নিহত হয় এবং অসংখ্য ঘাঁটি ধ্বংস হয়। পক্ষান্তরে আমাদের মাত্র ৮ জন সাথী শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

প্রশ্নঃ সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল মুসলিম বাহিনী কীভাবে সার্বিয়ান নিয়মিত বাহিনীর সাথে লড়াই করে টিকে আছে? তাদের প্রশিক্ষণের জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তরঃ জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার ফলে সেখানে ভারী বা মাঝারি ধরনের কোন অস্ত্র পৌঁছতে পারছে না। এজন্যে আমাদের হালকা অস্ত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রশিক্ষণের জন্য আমরা ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করেছি। সেখানে ১৫ দিনের কোর্স হয়। এ সময় যুবকদের জিহাদী জজবায় উদ্বুদ্ধ করার সাথে সাথে ক্লাসিনকোভ, হ্যাণ্ড গ্রেনেড ও অন্যান্য হালকা অস্ত্রের ট্রেনিং দেয়া হয়। রণাঙ্গণে যাবার সময় তাদের প্রত্যেককে ক্লাসিনকোভ ও প্রয়োজনীয় গুলী দেয়া হয়। বর্তমানে ত্রিশটি দেশের মুসলিম যুবকেরা এই ক্যাম্পে ট্রেনিং নিয়ে স্থানীয়দের পাশে থেকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ায় স্থানীয়দের সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারা আর নিজেদেরকে একা ভাবছে না, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে বলে মন করছে।

প্রশ্নঃ বসনীয় সার্ব এবং ক্রোটরা মুসলমানদের কিভাবে মূল্যায়ন করে?

উত্তরঃ সার্বরা অর্থোড্রক্স খৃষ্টান, তাদের পাদ্রীরা শিক্ষা দিয়েছে যে, তাদের ধর্মে বিশ্বাসী ছাড়া আর কারো দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এজন্য প্রথমে ক্যাথলিক ক্রোটদের সাথে তাদের বিরোধ বাঁধে। পরবর্তীকালে সকল খৃষ্টান রাষ্ট্রনায়কেরা তাদের মধ্যে সমাঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে উভয়কেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। ক্রোটদের সম্পর্কে ধারণা যে, তারা মুসলমানদের বন্ধু। এটা সম্পূর্ণ ভুল এবং ক্রোটদের প্রচারণা তারা সার্বদের মতই মুসলমানদের অবজ্ঞা করে এবং সুযোগ পেলে পদদলিত করে রাখার মওকা হাতছাড়া করে না। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বলছিঃ একবার আমাদের ক্যাম্পের কাছে একটা পেট্রোল পাম্পে তেল ভরা নিয়ে এক ক্রোট ও এক মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। মুসলমান আগে এসে তেল ভরতে শুরু করলে ক্রোট তাকে বাধা দেয়, তার দাবি সে পরে আসলেও খৃষ্টান হওয়ার কারণে তাকে আগে তেল ভরাতে

দিতে হবে। এ নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং ক্রোট মুসলমানকে হত্যা করে। এ খবর মুসলমানদের কাছে পৌঁছতেই তারা ক্রোটদের সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে তাদের ক্যাম্পের ওপর হামলা চালায়। এ লড়াইয়ে ১৮০ জন ক্রোট মারা যায়, মুসলমানদের মধ্যে শহীদ হয় ২০ জন। যুদ্ধে আমার মত লম্বা দাড়িওয়ালা একজন মুসলমান ক্রোটদের হাতে বন্দী হন। তারা মনে করে আবু আবদুল আজীজ গ্রেফতার হয়েছে এই আনন্দে তারা মিষ্টি বিতরণ করে। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে তারা ভুল বুঝতে পেরে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে আমাকে গ্রেফতার বা হত্যাকারীকে এক লাখ ডলার পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করে। বসনিয়া থেকে বের হওয়ার জন্য আমার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আলহামদুলিল্লাহ তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আমি বাইরে এসেছি। আমরা আভ্যন্তরীণ কোন লড়াইয়ে অংশ নিই না। এ যুদ্ধে স্থানীয়রা অশং নিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরও সকল পত্র-পত্রিকা ফলাও করে প্রকাশ করে যে, আরবরা অংশ নেয়ায় মুসলমানরা ক্রোটদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করছে।

প্রশ্নঃ আন্তর্জাতিক সকল প্রচার মিডিয়া সার্বদের ক্রমাগত বিজয়ের খবর প্রচার করে, এর সত্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

উত্তরঃ ইহুদী-খৃষ্টানদের নিয়ন্ত্রিত কোন কোন পত্রিকা একমাত্র সারাজেভো ব্যতীত আর সকল শহর সার্বদের নিয়ন্ত্রণে বলে প্রচার করছে। মূলতঃ এরা সার্বদের মিথ্যা প্রচারণার এজেন্সী নিয়েছে। সেব্রোনিয়াসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ শহর এখনো মুসলমানরা নিয়ন্ত্রণকরছে।

প্রশ্নঃ বসনিয়ার কত অংশ সার্বদের দখলে আর কত অংশ মুসলমানদের দখলে?

উত্তরঃ বসনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র সার্বরা নিয়ন্ত্রণ করছে। এক ভাগ ক্রোটদের দখলে ও বাকী অশং মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে।

প্রশ্নঃ আপনার এ সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

উত্তরঃ আমি মুসলিম বিশ্বে সফরের জন্য বের হয়েছি। আমি মুসলিম বিশ্বের কাছে বসনিয়ার মুসমানদের নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরতে চাই। মা-বোনদের পক্ষ থেকে তাদের সাহায্যের পয়গাম পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে আমি এ সফরে এসেছি। মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের বসনিয়ায় অস্ত্র সাহায্য প্রদানের দায়িত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়া আমার সফরের মূল উদ্দেশ্য। আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি যে, বসনিয়ার মুসলামনদের রক্ষার জন্য তারা পাশচাত্য ও জাতিসংঘের ওপর দায়িত্ব গছিয়ে দিয়ে ভুল করছে। পাশ্চাত্য বা জাতিসংঘ ইহুদী-খৃষ্টানদের রক্ষা করবে। মুসলমানদের নয়। তাইতো সার্বিয়া ও ক্রোশিয়ায় প্রচুর মুসলমান থাকা সত্ত্বেও সেখানে নির্ভেজাল খৃষ্টান সরকার মেনে নিয়েছে কিন্তু বসনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সরকারকে তারা মানতে নারাজ। ইউরোপের বুকে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের মানচিত্র তারা বরদাস্ত করতে পারছে না। আমি তাদের জানাতে এসেছি যে, তারা যখন জাতিসংঘের পানে তাকিয়ে আছে, তখন প্রতিদিন সারজেভো নগরীর ওপর পাঁচশো মর্টার, কামান ও ট্যাঙ্ক অবিরাম গোলা বর্ষণ করে চলেছে। এই গোলা বারুদে সে শহর ধ্বংস্তুপে পরিনত হচ্ছে। আহত ও গৃহহীন লোকদের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলছে। মিনি কেয়ামত চলছে বসনিয়ার সর্বত্র। অথচ জাতিসংঘ তা দেখতে পায় না।

প্রশ্নঃ পত্রিকার খবরে প্রকাশ জাতসংঘের সৈন্যরাও বন্দী মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করছে। কীভাবে তারা এ গর্হিত অপরাধ করার সাহস পেল? এর সত্যতা সম্পর্কে বলুন।

উত্তরঃ জাতিসংঘই যখন এ অপরাধের কথা স্বীকার করেছে তখন এর সত্যতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তারা মনে করেছে, এই মজলুম মহিলাদের ফরিয়াদ কে শুনবে? কে এদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে? জাতিসংঘের সৈন্যরা মুসলমানদের রক্ষার ধুঁয়া তুলে সার্বদের রক্ষা করার জন্যই বসনিয়ায় এসছে।

প্রশ্নঃ আমরা শুনেছি, যুদ্ধ শরু হওয়ার পর অধিকাংশ মুসলমান হিযরত করে চলে গেছে। বর্তমানে বসনিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা কত।

উত্তরঃ সাত লাখ মুসলমান হিজরত করে চলে গেছেন, যাঁদের অধিকাংশ শিশু, নারী ও বৃদ্ধ। যুবকেরা হিজরতের পরিবর্তে দেশে থেকে লড়াই করাকে শ্রেয় মনে করছেন। তাছাড়া সরকার যুবকদের দেশত্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্নঃ মুসলিমদেশের সাহায্যকারী সংস্থাগুলোর দেয়া সাহায্য সামগ্রী কি পর্যাপ্ত?

উত্তরঃ মোটেই না। এর চেয়ে খৃষ্টান এনজিওগুলো খৃষ্টান সার্ব-ক্রোটদের বহুগুণ বেশী সাহায্য সামগ্রী প্রদান করছে। সেবার ছদ্মবেশে এসব এনজিও পঁচিশ হাজার মুসলিম শিশুকে বিভিন্ন দেশে নিয়ে গিয়ে খৃষ্টান করে গড়ে তুলছে। এসব শিশুদের মায়েরাও জানেন না যে, তাদের সন্তানেরা কোথায় আছে। সন্তানকে বাঁচানোর স্বার্থে বাধ্য হয়ে অভাগা ময়েরা যে কেউ এসে শিশুদের নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে তাদের হাতে তার সন্তানদের তুলে দিচ্ছে। অথচ কেউ নেই খৃষ্টানদের খপ্পর থেকে এসব শিশুদের রক্ষা করার। এ ব্যাপারে একবার আমি বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলীজা ইজ্জত বেগের সাথে কথা বলছিলাম। তিনি জবাবে বলেন, "তোমার কাছে কি কোন সমাধান আছে? যদি কোন মুসলিম সরকার বা সাহায্য সংস্থা তাদের দায়িত্ব নেয় তবে আমরা তাদের উদ্ধারের জন্য বিশ্ব সংস্থাসমূহে চাপ দেব।" এরপর তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, "যে শিশুরা এখান থেকে চলে গেছে তাদের কথা বাদ দিয়ে যারা এখনও রয়ে গেছে তাদের কথা

(২৩পৃঃ দেখুন)

মুসলিম গণহত্যায় কাদিয়ানিদের কালোহাত

ফজলুল করাম . যশোরা

৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে মৃত্যু বরণ করেছে এদেশের লক্ষ লক্ষ নিরিহ মানুষ, নিহত হয়েছে শত শত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং নির্যাতিতা হয়েছে লক্ষ লক্ষ নারী। এ নির্যাতন ও গণহত্যা কোন বিচ্ছিন্ন তথা আকস্মিক ঘটনার ফলাফল নয় বরং এর পিছনে ছিল সুদূর প্রসারী ও সুপরিকল্পিত এক নীল নকসা। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তথাকথিত আহমাদিয়া জামাত ভুক্ত কাদিয়ানী সদস্যরাই ঘটিয়েছিল এ নির্যাতন ও গণহত্যার সিংহভাগ। বাস্তব ইতিহাসের নিরীখে এ সত্য আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

তবে স্বাধীনতার দু'যুগ পরে এ সত্যটি উপলব্ধি ও উদঘাটন করতে হলে কিছু ঐতিহাসিক পটভূমির আলোকে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। তাই আমরা কাদিয়ানী ষড়যন্ত্রের গোপন রহস্য ও তাদের বাংলাদেশী মুসলমানদের প্রতি আক্রোশ ও গণহত্যার কারণ সম্পর্কে কিছু তত্ত্ব ও তথ্য পেশ করছি।

মূলতঃ জগৎ শেঠ, উমী চাঁদ ও মীর জাফররের ঔরষজাত ইংরেজ মহারাণীর গর্ভজাত-অবৈধ টেষ্টটিউব সন্তান, এই কাদিয়ানী, আহমদীয়া গোষ্ঠী। প্রায় ৮শ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠি, সুযোগ সন্ধানী স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের সহযোগিতায় ছলে বলে কৌশলে ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা দখল করে নেয়। তবে ১৭৫৭ সালের পলাশী ময়দানের যুদ্ধ নাটকের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার পর থেকে এদেশের হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও তৌহিদী জনতা তাদের বিরুদ্ধে অবিরাম গতিতে চালিয়ে যায় সংগ্রাম ও প্রতিরোধ আন্দোলন। এমনকি ১৮৫৭ সালে এ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে, যা পরবর্তীতে তাদের ভাষায় 'তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ' (?) নামে আখ্যায়িত হয়। এ দীর্ঘ সময়ে এদেশবাসীকে দমন করার লক্ষ্যে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে অত্যাচার ও নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে যায়। এ সময় তারা ১৪ হাজার আলেমকে আগুনে পুড়িয়ে, ফাঁসীর কাষ্টে ঝুলিয়ে এবং লক্ষ্য তৌহিদী জনতাকে নির্মমভাবে শহীদ করে। অতঃপর দৃশ্যতঃ তথা কথিত সিপাহী আন্দোলন ব্যর্থ হলেও ইংরেজ জাতি বুঝতে পারলো যে, এভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে মুসলিম জাতিকে দমন করা মোটেই সম্ভব নয়। বরং এতে মুসলমানদের জেহাদী চেতনা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। এজন্য তারা মুসলিম জাতির অদৃশ্য শক্তির উৎস সন্ধান এবং তা নির্মূল করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ১৮৬৯ সালে উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি কমিশন বা প্রতিনিধি দলকে ভারতে প্রেরণ করে। উক্ত প্রতিনিধি দল প্রায় এক বছর যাবত ভারত বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের লাগাতার বিদ্রোহের জেহাদী প্রেরণার উৎস নির্ণয় এবং তা নির্মূল ও ধ্বংস করার উপায় সম্পর্কে একটি কার্যকরী রিপোর্ট তৈরি করে বৃটিশ সরকারের নিকট পেশ করে।

রিপোর্টের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ "মুসলমানদের ধর্মীয় নেতারা বৃটিশ শাসিত ভারত বর্ষকে দারুল "হরব' বা শত্রুদেশ বলে ফতুয়া জারী করার ফলে, মুসলমানদের জন্য ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে জিহাদ করা "ফরজ" বলে গণ্য হয়। এমনকি মুসলমানরা বিভিন্ন ফের্কাবন্ধী থাকা সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে তারা ইস্পাতের ন্যায় সুদৃঢ় ও কঠিন। আর তাদের এ জাতীয় ঐক্যের অন্যতম মূল ভিত্তি হলো "খতমে নবুওয়তের বিশ্বাস।"

তাই মুসলমানদের বৃহৎ ঐক্যে ফাটল ধরাতে হলে প্রথমতঃ "ডিভাইড এন্ড রুল"-এর পলিসি অবলম্বন করে মুসলমানদের বিভিন্ন ফের্কার মধ্যে স্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করতে হবে। এ কাজের জন্য মিয়া সম্প্রদায়কে কাজে লাগানো আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে। অধিকন্তু খতমে নবুয়তের বিশ্বাসের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি নিহিত রয়েছে তাতে ফাঁটল ধরাতে হলে তাদের মধ্যে আমাদের আস্থাভাজন একজন ব্যক্তিকে নবীরূপে দাড় করাতে হবে। অতঃপর ধর্মজ্ঞানহীন মুসলমানদের মধ্যে তার নবুওয়ত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের প্রতি আমাদের সরকারের সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এক সময় (তথাকথিত) নবীর মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়াতে হবে যে, "আমার নিকট অহী নাজিল হয়েছে যে, ভারত বর্ষে বৃটিশ সরকার আল্লাহ্‌র রহমত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।" এমনকি আল্লাহ্ পাক আমার নিকট আরো অহী নাজিল করেছেন যে, "এখন থেকে (ইংরেজদের বিরুদ্ধে) জিহাদ করা হারাম বলে ঘোষণা দেওয়া হল।" এভাবে মুসলমানদের অন্তর থেকে জিহাদের প্রেরণা ও উম্মাদনা দূরীভুত করা সম্ভব হবে। অন্যথায় ভারতে আমাদের শাসনকাল দীর্ঘায়ীত করা সম্ভব নয়।

হান্টার কমিশনের রিপোর্টে একথাও উল্লেখ ছিল যে, নবী সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আমাদেরকে অতি সন্তর্পনে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যে লোকটিকে নবুওয়তের দাবিদার রূপে তৈরী করব তাকে ওরিয়েন্টালিষ্টদের দ্বারা বিশেষ যত্নসহকারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, তার রচিত পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য আমাদের সরকার তাকে গোপনে অতি কৌশলে অর্থের যোগান দিবে। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ ও প্রচার বিভাগের সাহায্যে তার রচিত পুস্তকাদি মুসলমানদের সর্বমহলে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করে দিবে। এ সময় মুসলিম সমাজে তাকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত করার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তাহল একদিকে আমাদের পোষ্য উগ্র হিন্দু, আর্য সমাজ ও খৃষ্টান মিশনারীগণ ইসলামের ওপর আক্রমণ করে বই পুস্তক লিখবে। অপর পক্ষে আমাদের 'ওরিয়েন্টালিষ্ট' বা প্রাচ্যবিদদের সাহায্যে প্রস্তাবিত 'নবী' ও হিন্দু পাদ্রীদের বই পুস্তকের উত্তরে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ভাবে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বই পুস্তক রচনা করে ব্যাপক ভাবে প্রচার করতে থাকবে; এতে মুসলমানদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। অতঃপর সে আধ্যাত্মিক পীর সেজে তার প্রতি আকৃষ্ট ভক্তদেরকে মুরীদ বানাতে থাকবে। মুরীদদের মন মস্তিষ্ককে সে এমন ভাবে গড়ে তুলবে যাতে তারা মুসলিম আলেম সমাজের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। তখন সে নিজেও আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী আলেমদের সমালোচনা মূলক বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা এবং প্রবন্ধ লিখে প্রচার করতে থাকবে। এমনিভাবে মুসলমানদের একটি উল্লেখ যোগ্য অংশ যখন তার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ও ভক্তে পরিণত হবে তখন সে নিজেকে যুগের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক বলে দাবি করবে। এসময় সংস্কারের নামে সে এমন সব বক্তব্য প্রচার করবে যাতে তার ইমাম মেহেদী বলে দাবি করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এক সময় অনুকুল পরিস্থিতি বুঝে সে নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করে বসবে। ইমাম দাবী করার পর আবেগ প্রবণ মুসলমানরা হয়ত তার ওপর ক্ষেপে যেতে পারে এমনকি তাকে হত্যাও করতে পারে। তাই এ সময় তার হেফাজত ও নিরাপত্তার জন্য আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে সতর্ক থকার নির্দেশ দিতে হবে। ইত্যাবসরে ওরিয়েন্টালিষ্টরা তাকে নবুয়তী দাবির জন্য প্রস্তুত করে নেবে। একাজের জন্য তারা ইতিপূর্বে খতমে নবুওয়তের অপব্যাখ্যা ও নতুন নবী আগমনের লক্ষ্যে যে সব যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেছে ওসব প্রমাণাদী সংগ্রহ করে তার দাবীর সপক্ষে মজবুত প্রশিক্ষণ দেবে। তবে সে প্রথমেই সরাসরি নবী দাবী না করে পর্যায়ক্রমে জিল্লী নবী, বুরুজী নবী, উম্মতী নবী, শরীয়তী নবী ইত্যাদি দাবি উথাপন করে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হতে থাকবে। তারপর এক সময় পরিস্থিতি বুঝে সে নিজেকে শেষ নবী বলে দাবি করবে।

অবশ্য তার এ দাবীকে প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণ যোগ্য করতে হলে সরাসরি বৃটিশ সরকারকেও যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে হবে। অর্থাৎ দাবী অনুযায়ী যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে তার দলভুক্ত হবে, তাদের সরকারী চাকরীসহ সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধার দ্বার খুলে দিতে হবে। এতে দেখা যাবে, ইংরেজী শিক্ষিতদের একটি অংশ এবং দারিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত সাধারণ মুসলমানরা চাকরী-বাকরী ও সুযোগ সুবিধার লোভে নির্দ্বিধায় তাকে নবী বলে মেনে নেবে।

প্রতিনিধিদল আরো যুক্তি দেখালো যে, উক্ত নীল নক্সা অনুযায়ী আমরা যদি নতুন নবী সৃষ্টি করতে সক্ষম হই তবে এতে আমরা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকে আশাতীত সফলতা লাভ করতে পারব।

উইলিয়াম হান্টার রচিত 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্ ও ১৮৭০ খৃঃ লণ্ডণে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সের মুদ্রিত রিপোর্ট 'দি এ্যারাইবের অব দি বৃটিশ ইম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া থেকে উদ্ধৃত (কাদিয়ানী ধর্মমত পৃঃ-৫০-৫৫)

হাসার কমিশনের উপরোক্ত রিপোর্ট ও সুপারিশক্রমে বৃটিশ সরকার ভারতে কার্যত গোয়েন্দা বিভাগকে মুসলমানদের মধ্য হতে একজন আজন্ম দালাল ও কুচক্রিকে নবুওয়তের মিথ্যা দাবীর জন্য প্রস্তুত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তাকে নবী দাবীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে নির্দেশ দেয়। সরকারের নির্দেশ ক্রমে বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগ ভারতবর্ষের যাবতীয় ফেৎনার সূতিকাগার পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার কাদিয়ান নামক স্থানের গোলাম আহমদকে নির্বাচন করে। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার পরিবারটি তৎকালে বৃটিশ সরকারের দালালী ও পদলেহনী সর্বোচ্চ রেকর্ড সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। যার প্রমাণ স্বরূপ কাদিয়ানীর স্বরচিত বই পুস্তক থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

"আমার পিতা মরহুম গর্ভনরের দরবারে গেলে কুর্সি পেতেন। তিনি বৃটিশ সরকারের প্রকৃত কৃতজ্ঞ ও হিতাকাংখী ছিলেন।" (এজালায়ে আওহাস ১৫৭ পৃ)

"এ অধমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মির্যা গোলাম কাদের যত দিন জীবিত ছিলেন তিনিও পিতা মরহুমের পদাঙ্কনুসরণ করেছেন। তিনিও বৃটিশ সরকারের আন্তরিক খিদমতে মনে প্রাণে নিয়োজিত ছিলেন।" (শাহাদাতুল কুরআন পৃঃ ৮৪)

"ইংরেজ সরকারের পক্ষে আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার পুস্তক-পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপন ছেপে এদেশে ও অন্যান্য দেশে প্রচার করেছি। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ জিহাদের নাপাক ধারণা ত্যাগ করেছে। যা মূর্খ মোল্লাদের শিক্ষায় তাদের অন্তরে বদ্ধমূল

(২০ পৃঃ দেখুন)

আল্লাহর সাহায্য

কমাণ্ডার আমজাদ বেলাল আমি স্বচক্ষে দেখেছি

আরশাদ আলীর প্রাণে বেঁচে যাওয়া

হরকতের মুজাহিদ আরশাদ আলী ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর অস্ত্র নিয়ে ইসলামাবাদ শহরে পৌঁছে। সেখানে এক বন্ধুর কাছে অস্ত্র রেখে পায়ে হেটে নিজ গ্রাম পালাহ্ বটগাছের দিকে যাচ্ছিল। শোরিয়ারের বিরাট রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎ দু'টি ফৌজী জীপ এসে তার সামনে দাড়ায়। আরশাদ ভাবলো, দৌড়ে পালাতে চাইলে নির্ঘাত গুলি খেতে হবে। অতএব সে ভাল মানুষের মত রাস্তার এক পাশে দাড়িয়ে গেল। প্রথম জীপের সামনের সিটের এক অফিসার তাকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠেঃ "এদিকে আয়, কি নাম তোর?"

ঃ আরশাদ আলী।

ঃ বাড়ি কোথায়?

ঃ পালাহ বটগ্রাম।

অফিসার এক সিপাইকে তাকে তল্লাশী নিতে বলে। তল্লাসীতে আপত্তি কর কিছু না পাওয়া সত্ত্বেও অফিসার তাকে কানধরে মাথা নিচু করে দাড়াতে বলে। এবার আরশাদ বুকে সাহস নিয়ে বলেঃ "আমি কি অন্যায় করেছি স্যার, আমাকে কেন শাস্তি দিবেন?

অফিসারঃ "আগে তোমার কার্ড দেখাও?"

আরশাদঃ "আমি ট্রেনিং নিয়ে সবে মাত্র এসেছি কার্ড এখনও তৈরী হয়নি।"

অফিসারঃ হারামজাদা, এক ঘুষিতে তোর মুখ ভেংছে দিব। গাধা কোথাকার। কার কাছে কি বলছিস। ভাগ এখান থেকে পিছনে তাকালেই গুলি করব।

আরশাদ পরে জানায়, "আমি নিশ্চিত মনে করে ছিলাম, আমাকে সামনের দিকে দৌড়াতে বলে সে পিছন থেকে গুলি করবে। মৃত্যুর জন্য পুর্ণ প্রস্তুত হলাম। তবুও সামান্য আশা বুকে বেঁধে দ্রুত এলো মেলো দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু পিছন থেকে কোন গুলি এসে আমার শরীরে বিধল না। অথচ পিছনের জীপে একজন হিন্দু সি, আর, পি অফিসার বসা ছিল। [উল্লেখ্য যে, আরশাদ আলীকে তারা মুজাহিদ বলে সনাক্ত করার পরও কেন ছেড়ে দিল তার কারণ এবং সেই অফিসারের পরিচয় প্রকাশ করা বিশেষ কারণে সমীচিন নয় বিধায় গোপন রাখা হলো।) সোপুর থেকে এসে শ্রীনগরের লাল চকের নিকট 'মাইছমা' নামক এলাকার এক ঘরে অবস্থান নিলাম। এই মহল্লায় ইখওয়ানুল মুজাহিদের এক সাথী ট্রেনিং নিয়ে সবে মাত্র বাড়ি এসেছে। দশ বার দিন এদিক ওদিক কাটিয়ে প্রথমে যে দিন নিজ ঘরে আসে সেই দিনই গুপ্তচররা তার আগমনের খবর ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের পৌঁছে দেয়।

আমাদের অবস্থান থেকে পাঁচ ছ'টি ঘরের পর তার ঘর। গুপ্তচরের সংবাদ অনুযায়ী অতি ভোরে সৈন্যরা এসে তার বাড়ির গলীর মুখে অবস্থান নেয়। রাতের আধার কেটে পূর্ব আকাশ ফর্সা হওয়ার সাথে সাথে তারা মুজাহিদের ঘর ঘিরে ফেলে। সৈন্যরা ঘরের মধ্যে না ঢুকে বাইরে দাড়িয়ে মুজাহিদের নাম ধরে ডাকতে থাকে। সাধারণত ভারতীয় সৈন্যরা কাশ্মীরীদের কোন রকম অবগতি করা ছাড়াই তাদের ঘরে প্রবেশ করে। কিন্তু এখানে বিপদের আশংকা থাকায় বাইরে দাড়িয়ে তারা তাকে ডাকতে থাকে। অনাকাংখিত বিপদের মধ্যে পড়ে নবীন মুজাহিদ ঘাবড়ে যায়। পালাবার কোন পথ নেই। আর নিজ ঘরে বসে ওদের মোকাবেলা করার অর্থ ভাইবোন সবাইকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা। কোন উপায় না দেখে সে ঘরের মধ্যে হা হুতাশ করতে থাকে। পাঁচ ছ'জন সৈন্য এক সুযোগে তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঘরে প্রবেশ করে সৈন্যরা প্রথমে মুজাহিদ ও তার সাত বছর বয়সী ছোট ভাইকে শক্ত রশী দিয়ে বেঁধে ফেলে।

এরপর তার দুই যুবতী বোনের ওপর ওরা হায়েনার মত ঝাপিয়ে পড়ে। মানব সভ্যতার কলংক হিংস্র ভারতীয় সৈন্যদের উপর্যুপরি বলৎকার সহ্য করতে না পেরে দু'বোনই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। হিংস্র হায়েনাদের তাতেও তৃপ্তি হলো না। ওরা রশি দিয়ে বাঁধা ভাইদের সামনে মৃত বোন দু'জনার হাত পা কেটে রাস্তায় নিক্ষেপ করতে থাকে। তাদের এই বিভৎস অত্যাচার দেখে অসহায় দু'ভাই চীৎকার দিয়ে বলতে থাকে, ভাইয়েরা আমার! আমাদের বাঁচাও! সৈন্যরা আমার বোনদের কেটে টুকরো টুকরো করছে, তোমরা কেন এগিয়ে আসছো না? কোথায় আমার ভাইয়েরা, আমাদের বাঁচাও!

আমি অনেক্ষণ ধরে জানালার পাশে দাড়িয়ে তাদের সকরুণ চীৎকার শুনতে ছিলাম। তাদের প্রতিটি আহবানে আমারা শিউরে উঠছিলাম। সাধারণত শ্রীনগরের কোন ঘরে সৈন্যরা প্রবেশ করে অত্যাচার করলেও অন্য ঘর থেকে তাদের ওপর হামলা করা হয় না। কারণ, সৈন্যরা সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসে। অপ্রস্তুত মুজাহিদরা তাদের উপর গুলি ছুড়লে পাল্টা আক্রমনের

মোকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার উপর যে ঘর থেকে হামলা করা হয় সে ঘর ধুলিস্মাত করে দেওয়া হয়।

আমি অনেক্ষণ ধরে ভাবতে ছিলাম, কি করা যায়? একটি ব্যালকনিতে দাড়িয়ে সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকি। এবার ওরা শক্ত রশি দিয়ে হাত পা বাঁধা দু'ভাইকে রাস্তার ওপর দিয়ে টেনে হিছড়ে নিয়ে যেতে থাকে। এই অমানুসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা দু ভাই সেই অবস্থায় চিৎকার করে বলতে ছিলো, কোথায় লুকিয়ে আছো তোমরা!. ওরা আমার দুই বোনকে শহীদ করেছে। আমাদেরও হত্যা করতে নিয়ে যাচ্ছে। খোদার দোহাই তোমরা এগিয়ে আসো! আমাদেরক বাঁচাও। আমার মাসুম ভাইকে বাঁচাও। দুই বোনের কর্তিত ও ক্ষত বিক্ষত উলঙ্গ লাশের ও এক মুজাহিদ ভাইয়ের আকাশ ফাটানো চীৎকার আর সহ্য করতে পারলাম না। ভবিষ্যতের কথা মুহূর্তে ভুলে গিয়ে রাইফেল তাক করে এক ব্রাশে চারজন সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠালাম। অবস্থা বেগতিক দেখে বাকী সৈন্যরা প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালালো। অবলা নারীদের ওপর অত্যাচারে সিদ্ধ স্বশস্ত্র কাপুরুষরা নিজেদের অস্ত্র তুলে নেওয়ারও হিম্মত করলো না।

রশী বাঁধা সেই মুজাহিদ ওই দিনের লোহমার্ষক অত্যাচারের পর পাগল হয়ে গেছে। এখন সে অলি গলীতে ঘুরে আর চী ৎকার করে বলতে থাকে, ওরা আমার বোনদের হত্যা করেছে। আমার বোনদের অংগসমূহ কেটে টুকরো টুকরো করে রাস্তায় নিক্ষেপ করেছে। এখনও তোমরা বসে আছো, আমাকে বাঁচাও! আমার ভাইকে বাঁচাও ইত্যাদি বলে চীৎকার করে বেড়ায়। এর পর আর 'মাইছামা' থাকা নিরাপদ নয় ভেবে অন্য মহল্লায় চলে আসলাম।

মাইছামার অধিবাসীরা সমগ্র কাশ্মীর অধিবাসীর আজাদীর রাহবার। কাশ্মীর আজাদীর জিহাদ শুরু হয়েছে এখান থেকেই। এই মহল্লার নও জোয়ানরা সাহস, কৌশল ও বাহাদুরীতে সবার সেরা। এখানে যারা বাস করে তারা আফগানীদের বংশধর। যুগযুগ ধরে নাতিশীতোষ্ণ কাশ্মিরে বসবাস করলেও তাদের তেজ স্বভাব ও সাহস-হিম্মত সামান্য হ্রাস পায়নি। এখানকার মহিলারা পর্দানশীন। তারা বোরকা পরিধান করে। কিন্তু এতই সাহসী যে, রান্না ঘরের দা বটি নিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের মুকাবিলায় ঝাপিয়ে পড়ে। একবার এরা দা-বটি হাতে মাঠে নেমে আসলে এক মজার দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় সৈন্যরা তাদের দেখে পালাতে শুরু করে আর তাদের পিছনে পিছনে দা বটি নিয়ে ইসলামের বীরঙ্গনারা ধেয়ে পড়ে। জরুরী অবস্থার সময় এদের দেখা দেখি অন্যান্য মহল্লার মহিলারাও কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। এসব অবস্থায় দেখামাত্র গুলির নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কারফিউর সময় শ্রীনগর কোলাহল পূর্ণ জনপদে পরিণত হয়। কারফিউ চলছে কিনা তা মালুম করা যায় না। এই সাহসী মহিলাদের নজীর বর্তমান দুনিয়ায় নিতান্তই বিরল। কাশ্মিরীদের পরম বিশ্বাস, যত দিন মাইছামার সাহসী নারীরা নিস্তব্ধ না হবে ততদিন আজাদীর এ উত্তাল জোয়ার কেউ রুখতে পারবে না, কেউ টলাতে পারবে না তাদের ইস্পাত সমান কঠিন স্বাধীনতার শপথ।

ঝিলাযের পাড়ে ভারতীয় পোষ্টের উপর আক্রমণ

মধ্য শহরের ঝিলামের পাড়ে ভারতীয় সৈন্যদের পাহাড়ার পোষ্ট। এই পোষ্টে রাতে ত্রিশজন সৈন্য পাহাড়া দিত। এরা প্রায়ই বিনা কারণে সাধারণ লোকদের উপর নিপীড়ন চালাতো। সেখান থেকে যে সব বৃদ্ধ ও শিশুরা যাতায়াত করতো কিনা উস্কানিতে তারা তাদের কান মোচড়াতো। বাজার থেকে আনা তাদের সওদাপাতী ছিনিয়ে নিত। আর নওজোয়ানদের নদীর কিনারায় নিয়ে লাথি মেরে নীচে ফেলে দিত। তাদের এই অমানুষিক আচরণে বেশ কয়েকজন নিরিহ লোক পানিতে ডুবে মারা গেছে। এই পথে যাতায়াতকরী মহিলাদের তারা তালাশীর নামে বে—আবরু করে ছাড়তো। মোট কথা এই বেহায়া অমানুষরা স্থানীয় লোকদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কোন সুযোগ হাত ছাড়া করতো না। এদের এহেন কার্যাকলাপে ধৈর্য্য হারা হয়ে আমরা ক'জন ঠিক করলাম, যেভাবে এরা লোকদের নির্দীয় ভাবে নদীতে ডুবিয়ে মারছে আমরাও পুরো পোষ্ট সেভাবেই উল্টিয়ে নদীতে ফিকে মারবো। সর্বমোট আঠারজন মুজাহিদ এই আক্রমণের প্রস্তুতি নিলাম। দু'ভাগে ভাগ করে প্রথম আটজনকে গলীর মুখে পাঠানো হল। যেন সাহায্যকারী সৈন্যরা এসে আমাদের ঘিরে ফেলতে না পারে।

কথা ছিল অতি ভোরে আমরা দুটি লাঞ্চার দিয়ে পোষ্টের উপর রকেট ছুড়বো। রকেটের আঘাত পেয়ে ওরা আমাদের মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকবে। এই ফাঁকে অপর পাশ দিয়ে তিনজন সাহসী মুজাহিদ শক্তিশালী বোম নিয়ে পোষ্টে ঢুকে সাথে সাথে তার বিস্ফোরণ ঘটাবে। এ কাজ ছিলো অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ। যারা বোম বিস্ফোরিত করবে তাদের পক্ষে অক্ষত বেঁচে যাওয়া অসম্ভব হবে। কিন্তু এছাড়া পোষ্ট ধ্বংসের অন্য কোন সহজ পদ্ধতি আমাদের পরিকল্পনায় ছিল না। আমরা রকেট ফায়ার করার জন্য পূর্বের রাতে যে স্থান নির্বাচন করে ছিলাম সকালে গিয়ে দেখি সৈন্যরা সেদিক দিয়ে চাঁদরের মত লম্বা চেপ্টা লোহার পাত টানিয়ে পোষ্টটিকে আড়াল করে রেখেছে। স্থানীয় লোকদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম, সৈন্যরা আমাদের গতিবিধি টের পেয়েছে। অতএব উপস্থিতভাবে পূর্বের পরিকল্পনা পাল্টিয়ে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। এ পাশ থেকে লোহার পাতের ফাঁক গলিয়ে রকেট ছুড়লে তা তেমন কার্যকরী হবে না। একারণে অপর পাশ দিয়ে এক যোগে রকেট ও ক্লসিনকভ দ্বারা হামলা শুরু করলাম।

সৈন্যরা পূর্বেই প্রস্তুত ছিল। গোলা–গুলি শুরু হলে পোষ্টের সাহায্যের জন্য প্রধান ক্যাম্প থেকে চারটি সাজোয়া গাড়ী পোষ্টের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। এক সাথে দুই দিকের মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে রকেটের গোলাও ছিলো সীমিত। সর্বশেষ গোলাটি সাজোয়া গাড়ির ওপর ছুড়ে এল, এম, জির ফায়ার করতে করতে নিরাপদ জায়গায় পৌছে গেলাম।

পরদিন সরকারী প্রেস নোটে সাতজন সৈন্য নিহত ও দশজন আহত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। নদীর কিনারের মরিচা থেকে যে সৈন্যরা আমাদের মোকাবেলা করতে ছিল তারা গুলী খেয়ে ছটফট করতে করতে নদীতে পড়ে ডুবে মারা যায়। এই ঝুকিপূর্ণ অপারেশনে কোন মুজাহিদ হতাহত হওয়া ছাড়া আল্লাহ্ আমাদের মনের ইচ্ছা পূরণ করেন। নদীতে ফেলে ডুবিয়ে মারার কৌতুকের শাস্তি কত ভয়াবহ ও করুন তা এই পোষ্টের সৈন্যরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

এক মজার আলাপ

অক্টোবরের শেষের দিকে আমাদের দু'জন মুজাহিদ ঝিলাম নদীর কিনারা দিয়ে যাচ্ছিলো। তাদের একজন অন্যজনকে বল্লো, "চল গোছল করে নি।" তারা জামা কাপড় খুলে তার নীচে পিস্তল ঢেকে রেখে নদীতে গোসল করতে নামে। এর মধ্যেই দুজন ইণ্ডিয়ান সৈন্য পানি তুলে নেয়ার জন্য নদীর কিনারে আসে। তাদের একজনের কাছে একটি বালতি, আর দ্বিতীয়জন একটি রাইফেল হাতে তার পিছনে দাড়িয়ে আছে। মুজাহিদদ্বয় গোছলে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ কিনারায় তাকিয়ে দেখে, একজন শত্রুসৈন্য দাড়িয়ে আছে। একজন মুজাহিদ বুদ্ধি খাটিয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলালো, "স্যার কেমন আছেন?" সামান্য সিপাইকে স্যার বলায় তারা খুশীতে বাগ বাগ। ওরা বললো, তোমরা কারা? কোথা থেকে এসেছো? তারা বল্লো, স্যার আমরা ঐ গ্রামের লোক, ক্ষেত খামারে কাজ করি। একটি সৈন্য বললো, তোমাদের গ্রামে তো কোন দুষ্কৃতকারী নেই? মুজাহিদ জওয়াবে বললো, "কি যে বলেন স্যার, আপনারা এখানে থাকতে কোন সাহসে ওরা এদিকে আসবে? এবার সৈন্যটি ভরসা পেয়ে এক মুজাহিদের সাথে আলাপ জুড়ে দেয়। অপর সিপাহী পানি তোলার জন্য বালতি নিয়ে নদীতে নেমে পড়ে। অন্য মুজাহিদটি নদী থেকে উঠে খুব সতর্কতার সাথে কাপড় পরার ভান করে পিস্তল তুলে সৈন্যটিকে লক্ষ করে এক গুলি ছুড়ে দেয়। গুলি খেয়ে সৈন্যটি ঘুরতে ঘুরতে নদীতে পরে যায়। তার রাইফেলটি কিনারায় পড়ে থাকে। মুজাহিদের হাতে বেশী সময় ছিলো না বলে রাইফেলটি তুলে এক গুলিতে অপর সৈন্যটিকে মেরে ঝিলামে ভাসিয়ে দ্রুত অন্যত্র চলে যায়। [চলবে]

অনুবাদঃ মনজুর হাসান

হাঁপানী, যৌন ও স্ত্রীরোগসহ পুরুষ ও মহিলাদের যাবতীয় জটির রোগে সু–চিকিৎসা করা হয়

আমরা দীর্ঘদিন যাবত দেশে ও বিদেশের বিপুল সংখ্যক হাঁপানী, যৌন ও স্ত্রীরোগসহ পুরুষ ও মহিলাদের বিবিধ জটির রোগের সু–চিকিৎসা করে আসছি। এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র পার্শ–প্রতিক্রিয়ামুক্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ সকল চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে। আপনিও আপনার শারীরিক, মানসিক যে কোন অসুস্থতার জন্য আমাদের পরামর্শ ও সফল চিকিৎসা গ্রহণ করে রোগমুক্ত সুস্থ–সবল–সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হউন।

ডাকযোগেচিকিৎসাঃ দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত যে সকল রোগীগণ আমাদের চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী কিন্তু নানাবিধ কারণে সরাসরি চিকিৎসা নিতে পারছেন না, তাঁদের জন্য ডাকযোগে সু–চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আপনার শারীরিক, মানসিক অসুস্থতার কথা লিখে জানান। আমরা আপনার সু–চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

চিঠি লেখার ঠিকানাঃ আলম এণ্ড কোম্পানী, ২ আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা–১২০৩।

[illegible] সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা থাকে।

আলম এণ্ড কোম্পানী

(হোমিও ঔষধ আমদানীকারক, বিক্রেতা ও শ্রেষ্ঠ হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র)

প্রধান শাখাঃ ২ আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা–১২০৩, ফোনঃ ২৫৪১৪৩
(দৈনিক ইত্তেফাক ও ইনকিলাব বিল্ডিং–এর মাঝে)

২য় শাখাঃ ৩১১, গভঃ নিউমার্কেট, ঢাকা–১২০৫। (রূপালী ব্যাংকের পার্শ্বে) ফোনঃ ৫০৯০৯৯

Teldx: 632162 CONTL BJ. Fax: 880-2-863379, Atten: ALAM & COMPANY

থাই মুসলমানদের অতীত ও বর্তমান

নাসীম আরাফাত

থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংকক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এক অত্যাধুনিক শহর। প্রাচ্য মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তথা বিশ্বজুড়ে তার সুনাম সুখ্যাতি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ছয়টি রাষ্ট্র মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ব্রুনাই, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যাণ্ডকে একত্রে এশিয়ান বলা হয়। এছাড়া কম্পোডিয়া, ভিয়েতনাম, লাওসও দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত। পৃথিবীর প্রসিদ্ধ চার ধর্ম হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান অনুসারীরা এশিয়ানে বাস করলেও সামগ্রিক ভাবে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী।

এশিয়ানের ছয়টি রাষ্ট্রে গড়ে ৫৬% জন মুসলমান বাস করে। ইন্দোনেশিয়ায় ৮৫%, ব্রুনাইয়ে ১০০%, মালেশিয়ায় ৫৭%, সিঙ্গাপুরে ১৭%, ফিলিপাইনে ৯% আর থাইল্যাণ্ডে ১০% জন মুসলমানের অধিবাস।

ইতিহাসের আলোকে থাইল্যাণ্ড

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত থাইল্যাণ্ডকে শ্যাম নামে অবহিত করা হতো। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অত্র অঞ্চল শাসন করতো। সর্বপ্রথম ফিল্ড মার্শাল সোল গারাম একে থাই নামে অভিহিত করে। যার অর্থঃ আজাদ মানুষ। ১৩শ' শতাব্দি থেকে থাইল্যাণ্ডে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। মালয়েশিয়ান মুসলমানরাও ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার্থে থাইল্যাণ্ডে বসবাস শুরু করে। ১২৫৭-১৩৪৭ পর্যন্ত শোকেথাই রাজপরিবারের শাসনামলে থাইল্যাণ্ডে মুসলমানদের আগমনের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রাচীন শিলালিপিতে "পসার" শব্দটি পাওয়া যায়। ফারসী ভাষায় যার অর্থ-বাজার। PREACHINGS OF ISLAM-এর গ্রন্থকার লিখেছেন, মালয়েশিয়ার সীমান্ত বরাবর থাইল্যাণ্ডে এখনো প্রাচীন মুসলমানদের ঐতিহ্য ও কীর্তি বিদ্যমান।

১৩৫০-১৭৪২ সাল পর্যন্ত আইয়োথিয়া রাজশাসনামলে থাই মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি-সামর্থ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া আরব, ইরান, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া তথা বহু দেশ থেকে মুসলমানরা থাইল্যাণ্ডে এসে বসবাস শুরু করে। মুসলমানরা সরকারী অফিস আদালতে চাকুরি শুরু করে। ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষি কাজেও তারা অনেক এগিয়ে যায়। ইরান থেকে আগত সাইখ আহমদ ও সাইখ সোলায়মানের প্রজন্মরা তখন বেশ প্রতিপত্তি অর্জন করে। তারা স্থানীয় অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে শাহী খান্দানের সাথে আত্মিয়তার সূত্রে জড়িয়ে পড়ে। বর্তমান মালয়েশিয়ায় পেনাং অঞ্চলে তখন বহু মুসলমান বাস করতো। মালুক, ভিয়েতনাম, জাভা এবং ভারতের সাথে তখন থাই মুসলমানদের বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ছিলো। একারণে থাইল্যাণ্ডে মুসলমান আগমনের পথ অনেকটা সুগম হয়। মুসলিম শাসকবর্গের সাথেও তখন থাইল্যাণ্ডের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। সুফুরী সালতানাতের বাদশাহ শাহ সুলাইমান (১৬৬৫-১৬৭৪) আয়োথিয়ার রাজদরবারে বাণিজ্য কাফেলা প্রেরণ করেন এবং থাই বাদশাহ বংগ নারায়ণকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। থাই মুসলমানদের তখন BROTHES (পরদেশী) বলা হতো যা মূলত হিন্দিশব্দ PAROEST থেকে থাই ভাষায় প্রবেশ করেছে। ব্যাংককে অবস্থিত থাই জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের ছবি সম্বলিত বই আজো দিল্লীর সম্রাট ও আইয়োথিয়ান রাজার সুসম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৭৬৭ সালে বর্মীরা আইয়োথিয়া রাজ্যে আক্রমন চালালে মুসলমানরা প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলে। থাই ও কম্বোডিয়ার মুসলমানরা জীবনের ঝুকি নিয়ে সশস্ত্র রণতরীগুলোর সুদক্ষ কাপ্তান হয়ে দেশ রক্ষার জিহাদে অবতীর্ণ হন।

১৭৮৬ সালে পাতানী অঞ্চলে বৌদ্ধ বাহিনীর আক্রমণে পর্যুদস্ত হাজার হাজার মুসলমানদের দাস বানিয়ে থাইল্যাণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করে। নিপীড়িত এই দাস মুসলমানদের দ্বারাই আজকের এই তিলোত্তমা শহর ব্যাংককের শোভা বৃদ্ধি করা হয়। আজো সেই নির্যাতিত মুসলমানদের উত্তরসূরীরা ব্যাংকক, আইয়োথিয়াহ থাইল্যাণ্ডের বিভিন্ন শহরে বাস করছে। শাহ মাকসীনের শাসনামলে মুসলমানদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। লঘু গুরু সকল অপরাধে মুসলমানদের মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র শাস্তি নির্ধারিত হয়। নও মুসলমানদের শিরোচ্ছেদ করা হয়। শাহ সোনিং খানের শাসনামলে মুসলমানদের মনে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। তখন ইরানী শাইখ আহমদ ও শাইখ সাঈদকে রাষ্ট্রের উচ্চপদে আসীন করা হয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। শিয়া সম্প্রদায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত অতি চতুরতার সাথে এ পদটি দখল করে রাখে। বাহরাহ, ইসমাইলিয়াহ, ইমামিয়াহ শিয়াদের এ তিনটি দলই থাইল্যাণ্ডে বাস করতো। তবে ইমামিয়ারাই ছিলো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দারুন শক্তিশালী। ধীরে ধীরে এখন তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে

আসছে। ১৯৪৫ সালে সুন্নী মতাবলম্বী আলহাজ্ব শামসুদ্দীন মোস্তফা আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে থাইল্যাণ্ডে ফিরে এলে সরকার তাঁকে মন্ত্রীত্বের পদ দান করেন।

থাই মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে ৫২ লাখ মুসলমান থাইল্যাণ্ডে বাস করছে। যা থাই জনগণের ১০%। সারা থাইল্যাণ্ডে মুসলমানদের বাস থাকলেও দক্ষিণাঞ্চলের চারটি প্রদেশেই মুসলমানদের জন সংখ্যা বেশী। সেখানে ৭৪% জন মুসলমান বাস করে। মুসলমানরাই এখন থাইল্যাণ্ডে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু জাতি।

সারা দেশের আড়াই হাজার মসজিদের মধ্যে রাজধানী ব্যাংকক ও দক্ষিণাঞ্চলীয় চারটি প্রদেশেই এর অধিকাংশ অবস্থিত। থাই মুসলমানরা নিজেদের ইমান আকীদা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখছে। ইতিপূর্বে থাই মুসলমানদের আঞ্চলিক ভাষায় (মেহমান বা পর্যটক) বলা হতো। এখন সরকারী ভাবেই "থাই মুসলমান" শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

শিক্ষা দীক্ষা ও জীবন ধারা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মুসলিম শিশু কিশোরদের জন্য ইসলামী পাঠ্য পুস্তক রচিত হলেও শিক্ষা দীক্ষায় থাই মুসলামনরা অনেক পিছিয়ে। ৮৩% জন মুসলমান অশিক্ষিত বা প্রাইমারী শিক্ষিত। তবে শিক্ষিতদের বিশেষতঃ আরব থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে যারা ফিরে আসে তাদের বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা রয়েছে থাই মুসলিম সমাজে।

সম্প্রতি পাকিস্তান ও ভারতের সাথে থাই ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক সম্প্রসারিত হলেও সাধারণ মুসলিম জনগণের জীবন যাত্রা একেবারে নিম্ন পর্যায়ের। বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলীয় চারটি মুসলিম প্রধান প্রদেশে মুসলমানদের অবস্থা বড়ই করুন। ৭৫% জন থাই মুসলমান কৃষক, ৯% সাধারণ ব্যবসায়ী। অধিকাংশ কৃষকরা ধান ও রাবারের চাষ করলেও সরকারী ভাবে তারা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। অনেকে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ করে জীবিকা অর্জন করে। সেখানেও বড় বড় সওদাগরদের মোকাবিলায় মুসলমানরা কোনঠাসা।

দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ১২ জন মুসলমান থাই জাতীয় পার্লামেন্টে সদস্য নির্বাচিত হয়। তাদের ৭ জনই দক্ষিণাঞ্চল থেকে নির্বাচিত। অবশ্য ইতিপূর্বে দক্ষিণাঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলন পুরোদমেই চলছিলো। এক পর্যায়ে তা সশস্ত্র জিহাদেরও রূপ নেয় এবং মুসলমান সংগঠন গুলো বহু শক্তিশালী হয়ে উঠে। ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ পাতানী; লিবারেশন ফ্রন্ট অফ রিপাবলিক- পাতানী, পাতানী ইউনাইটেড অর্গানাইজেশন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উদ্দেখ যোগ্য। এ দল গুলোর অধিকাংশ সদস্যই শিক্ষিত, সচেতন ও মার্জিত যুবক—যারা রাষ্ট্রীয় অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার। দলগুলোর মতাদর্শ ভিন্ন থাকলেও থাইল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েমে তারা ছিলো ঐকমত্য। আন্দোলন চলাকালে মুসলিম বিশ্বথেকে পাতানী মুসলমানদের স্বাধীনতার স্বপক্ষে কোন সাড়া না পাওয়ায় ধীরে ধীরে সে দায়ী দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সরকারও মুসলমানদের দাবি দাওয়া ও সমস্যা সমাধানের বাস্তব পদক্ষেপ নিতে থাকলে সশস্ত্র আন্দোলনের ধারা স্তিমিত হয়েযায়।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

১৯৪৫ সালে এক সরকারী ফরমানে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়। সরকারী উদ্যোগে জাতীয় মুসলিম কাউন্সিল গঠন করা হয়। এ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠন করা হয়। মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণে মন্ত্রণালয় গুলোকে পরামর্শ দান করা ও এর পক্ষে সরকারী ফরমান জারী করানোই এ কাউন্সিল গুলোর প্রধান দায়িত্ব। ১৯৪৬ সালে দক্ষিণাঞ্চলীয় চারটি প্রদেশে মুসলমানদের ইসলামী উত্তরাধীকার আইন অবলম্বনের অনুমতি প্রদান করা হয়। এলক্ষ্যে দুইজন মুসলিম জজকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৭ সালে মসজিদ আইনের আওতায় ইমাম, খতীব, মোয়াজ্জিনদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয় এবং প্রত্যেক মসজিদের জন্য কাউন্সিল গঠন করা হয় যা আজও সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। মুসলমানদের স্বাভাবিক ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকলেও সংখ্যা গুরু বৌদ্ধদের জাতীয় মুসলিম বিরোধী চক্রান্ত কখনো থেমে যায় নি।

থাই মুসলমানদের সমস্যাবলী

(১) মুসলমানদের জীবন যাত্রার মান খুবই নিম্ন। (২) মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্যের অভাব (৩) মুসলমানদের বিজাতি চিহ্নিত করতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অপচেষ্টা (৪) মুসলিম নামের পরিবর্তনের মাধ্যমে সংস্কৃতিকভাবে মুসলমানদের পরাজিত করার অপকৌশল। (৫) মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বৌদ্ধ কলোণী স্থাপন (৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে বৌদ্ধমূর্তির সামনে সেজদাবনত হওয়া (৭) জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করে মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস করা।

দাওয়াতের কাজে সমস্যাবলী

(১) সার্বিক ঐক্যের অভাব

মুসলিম সংগঠনগুলো যুগোপযোগী পদক্ষেপ না নেয়ার কারণে সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর জরাজীর্ণতাসহ যুগোপযোগী শিক্ষাদানে অনেক পিছিয়ে। ৪০/৫০ বছরের পুরাতন পাঠ্য পুস্তকের পাঠদানের কারণে সচেতন যুগোপযোগী

শিক্ষিত লোক তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। অবশ্য ইতিমধ্যে কিছু সচেতন যুবক পাকিস্তান, ভারত ও আরব দেশগুলো থেকে পড়াশুনা করে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন তৈরি করছে। যা জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য একেবারেই অপ্রতুল।

(২) সাংগঠনিক সমস্যা

নাম সর্বস্ব বহু সংগঠন সম্বুক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, যা দ্বারা মুসলিম জাগরণের কোন আশা করা যায় না। প্রত্যেক বছর কমিটি পরিবর্তন হচ্ছে অথচ যুগোপযোগী কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। কতক সংগঠন আবার কর্মসূচী অনুযায়ী অর্থ সংস্থান করতে না পেরে সরকারী সাহায্য কামনা করে নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে।

(৩) মাসায়েল কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব–সংঘাত

অদূরদর্শীতার কারণে ইখতেলাফী মাসায়েল নিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এ জন্য পরস্পরে বাদানুবাদ, মনোমালিন্য ও অপ্রতিকর ঘটনাও ঘটছে। যে কারণে অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত পৌছানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

(৪) মুসলিম দেশগুলোর পরস্পরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

মুসলিম দেশগুলোর পরস্পরিক যুদ্ধের ঘটনা থাই মুসলমানদের মাঝে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অমুসলিমদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে প্রাচীর সম বাধার সৃষ্টি করেছে। কিছু সংগঠন কোন আরব দেশের লেজুড় হওয়ায় জাতীয় ঐক্যের সম্ভাবনা ক্রমশ দূরবর্তী হচ্ছে।

(৫) আরবী ভাষাজ্ঞানের অভাব

কুরআন হাদীস সহ ইসলামী জ্ঞানের ৭৫% ভাগই আরবী ভাষায় লিখিত হওয়ার কারণে বিভিন্ন সংগঠন প্রধানদের আরবী ভাষা জ্ঞান না থাকায় ইসলামী জ্ঞানে অপরিপক্ক নেতা–কর্মীরা সমাজে সঠিক ও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারছে না। আবার ইংরেজী না জানার কারণে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সাথে মিশে দাওয়াত পৌছানোও সম্ভব হচ্ছে না।

(৬) ইসলামী বই–পুস্তকের অভাব

এ পর্যন্ত গুটি কতেক ধর্মীয় গ্রন্থ থাই ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তন্মধ্যে কুরআন তরজমা, বোখারী শরীফের তরজমাসহ সাইয়েদ কুতুব, হাসানুল বান্না ও আহমদ দীদার প্রমুখ আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদদের কিছু ধর্মীয় গ্রন্থ থাই ভাষায় অনূদিত হয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। অমুসলিমদের নিকট দাওয়াত পৌছাতে ইংরেজী ভাষায় অনুদিত পুস্তকের খুব প্রয়োজন।

ইসলামী সংগঠন সমূহ

জমিয়াতুল ইসলামী ফাউণ্ডেশন অফ ইসলামিক সেন্টার অফ থাইল্যাণ্ড, ইয়ং মুসলিম এসোসিয়েশন অফ থাইল্যাণ্ড, ইনিষ্টিটিউট অফ ইসলামিক স্টাডিজ। থাই মুসলিম ষ্টুডেন্ট এসোসিয়েশন, মুসলিম এসোসিয়েশন অফ থাই ইউর অফ ইসলাম, থাই মুসলিম ফাউণ্ডেশন বরায়ে, এতীম বাগছা, দারুল আহলিয়াত, মুসলিম মেডিকেল এসোসিয়েশন, দি মুসলিম ফাউণ্ডেশন, মুসলিম মাস কমউনিকিশন এসোসিয়েশন, ইসলামিক গাইডেন্স পোষ্ট ইত্যাদি। তবে বর্তমানে মুসলিম এসোসিয়েশন অফ থাইল্যাণ্ড সব চেয়ে বেশী কর্মতৎপর। রাজধানী ব্যাংককের যুবক কৌসুলী মোহাম্মদ জালালুদ্দীন এর প্রধান দায়িত্বশীল। ইসলাম প্রচার ও ইসলামী সংগঠন গুলোর মধ্যে পরস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সংগঠনটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাথে সাথে ইয়ং মুসলিম এসোসিয়েশনও দাওয়াতের কাজে অনেকটা এগিয়ে গেছে। অত্যাধুনিক মাধ্যম ব্যবহার করে অল্প সময়ে চারিদিকে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিচ্ছে।

প্যারাডাইস অপটিক্যাল কোং

চশমার জগতে একটি নতুন নাম
প্রত্যহ বিকালে চক্ষু বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন

২, পাটুয়াটুলি, ঢাকা–১১০০
ফোনঃ ২৮২৪৮৩

তথাকথিত প্রগতিবাদ পশুবাদেরই নামান্তর

মোহাম্মাদ ফারূক হোসাইন খান

আজকাল প্রগতির বাজারে একটা বাক্যের খুব কাটতি যাচ্ছে। প্রগতিবাদীদের মুখে মুখে ফিরছে 'মধ্যযুগীয় জাহেলিয়াত বা বর্বরতা'—এই বাক্যটি। এনারা মধ্য যুগের কোন কিছুকেই সহ্য করতে পারেন না। মধ্যযুগের সমাজ, শাসন ব্যবস্থা, পারিবারিক বন্ধন, সংস্কৃতি সবটাই এদের না পছন্দ। মনে মনে ভাবেন, বিজ্ঞানের টর্চলাইট জ্বেলে দুনিয়াটা আমরা ফকফকা করে দিয়েছি। আমরা নির্মাণ করেছি শ্রেষ্ঠ সভ্যতা। সভ্যতার শিখরে আরোহণ করার বাহাদুরী জাহির করে তারা ইচ্ছেমত দোল খান, পা নাচান আর প্রগতির কোরাশ গান। নিজেকে সভ্য মানুষ প্রমাণ করার জন্য অতীতের মানুষদের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সার্বিক জীবন ব্যবস্থাকে উদ্দেশ্য করে অফুরন্ত গালি বর্ষণ করেন। কোন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা অথবা কোন গোষ্ঠির জীবন ব্যবস্থা, জনমত, বিচার ব্যবস্থা ওনাদের পছন্দ না হলে তার গায়ে একখানা 'মধ্যযুগীয় চিন্তা বা বর্বরতা' ধরণের স্টিকার সেঁটে দেন। এই স্বঘোষিত মহা মানবেরা কল্পনার ঘোড়ায় চরে সভ্যতার চরম শিখরে পৌছে যাওয়ার গলাবাজী করেন কিন্তু দুনিয়ার কোটি কোটি ভুখা, পঙ্গু, পুষ্টিহীন, অশিক্ষিত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের প্রতি এদের নজর পড়ে না। অথচ এরা দাবি করে, দুনিয়া সভ্যতার চরম শিখরে উপনীত আর আমরা সেই দুনিয়ার সুসভ্য সদস্য। তাহলে শোষিত, বঞ্চিত কোটি কোটি আবদুল্লাহ্, যোগেস, ডেভিডরা কোন দুনিয়ার সদস্য? এদের শাসনের নামে শোষণ ও বঞ্চিত করে যারা সভ্যতার মা-বাপ সেজেছেন তাদের সংখ্যাটাই বা কত? খুব একটা বেশী নয়। অথচ এই গুটিকতক ফরসা সভ্যতার দাবীদাররা তাদের উন্নতি দিয়েই গোটা দুনিয়ার সভ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় করছেন। এবার আমরা একটু এই সুসভ্য মানুষদের ঘৃণিত (!) মধ্য যুগের প্রতি দৃষ্টপাত করব যে, সেটা কি জিনিস ছিল।

সভ্য যুগের পোদ্দাররা মধ্যযুগ বলতে যা' বোঝায় তা' হল রাসূল (সাঃ)-এর নবুয়াত লাভের পর থেকে ইসলামের বিকাশ, সোনালী যুগসহ পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে। এসময় ইসলাম আরব ভূখণ্ড থেকে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া ও পাক-ভারত উপমহাদেশের বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে। দেড় হাজার বছর ব্যাপী মুসলমানরা দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে বিশ্বকে সত্যের পথে নেতৃত্ব দেয়। আজকের কারিগরি, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আধুনিক সভ্যতার পত্তনসহ সবকিছু নতুন আদলে ঢেলে সাজান এবং এসবকে একটা মজবুত ভিত্তির ওপর দাড় করান। তাঁরাই কিন্তু ইসলামের নবী ও ইসলামকে অস্বীকারকারী ইউরোপের খৃষ্টান ও ইহুদী শক্তি ইসলামের এই উন্নতিতে প্রতিহিংসায় জ্বলে পুড়ে মরেছে। এ শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য দুই শতাব্দী যাবত তারা অসংখ্য ক্রুসেডের অবতারণা করেছে। অপরাজেয় মুসলিম শক্তিকে মোকাবিলা করার জন্য তৎকালীন ইউরোপে কোন একক শক্তি ছিল না। সুতরাং এজন্য তাদের পুরো ইউরোপের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। আর এ কাজের জন্য তারা চরম ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের ধর্মীয় আবেগকে উস্কে দেয়ার হীন নীতির আশ্রয় নেয়। খৃষ্টান পাদ্রীরা ঢালাওভাবে মুসলমানদের বর্বর, অসভ্য, অবিশ্বাসী, শয়তান প্রভৃতি রূপে চিহ্নিত করতে থাকে এবং সমগ্র খৃষ্টান জগতে ঘোষণা করে দেয় যে, এদের ধ্বংস করে দেয়া প্রভুর নির্দেশ, এটা প্রত্যেক খৃষ্টানের পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য। যারা এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করবে তাদের পাপ যিশু মোচন করে দেবেন এবং স্বর্গলাভ তাদের জন্য নিশ্চিত। একমাত্র খৃষ্টান ছাড়া আর কারো এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অধিকার নেই, ইত্যাদি। ব্যাস, পুরো ইউরোপ উন্মত্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একটার পর একটা মুসলিম বিশ্বের ওপর আছড়ে পড়তে থাকে। এক ক্রুসেড শেষ হতে না হতেই ইউরোপে আরেক ক্রুসেডের ডঙ্কা বেজে উঠতে থাকল।

সেদিনের খৃষ্টান পাদ্রীরা খৃষ্ট সমাজকে ইসলাম সম্পর্কে যে হিংসা ও বিদ্বেষ প্রসূত ধারণা দিয়েছিল আধুনিক খৃষ্ট জগত সেই ক্রুসেডীয় উন্মাদনার সাথে সাথে এখনও সে ধারণা লালন করে চলছে। আজও খৃষ্ট জগত এমন ধর্মান্ধতায় ভুগছে যে, তারা ইসলামকে মনে করে সম্পূর্ণ একজন মানুষের সৃষ্ট মতবাদ এবং এর পেছনে গড বা আল্লাহর কোন ভূমিকা নেই। প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ডঃ মরিস বুকাইলী (যিনি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন) তার বিশ্বখ্যাত 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' বইতে বলেন, "তাদের কাছে কুরআনের কোনো উদ্ধৃতি দেওয়াটা শয়তানের বরাত দিয়ে কোন কথা বলার সমান!"

এ খৃষ্টানরা আজও মুসলমানদের যে করে হোক ধ্বংস করে দেয়ার সুযোগ খোঁজে একমাত্র ওই গোঁড়া ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি স্বভাবজাত গোড়ামীর জন্য তারা ঢালাওভাবে

মুসলমানদের স্বর্ণালী ইতিহাসকে কালিমা লিপ্ত করার জন্য এই সময়কে মধ্যযুগীয় বর্বরতার যুগ বলে আখ্যায়িত করে। ইসলামের নবী, তাঁর প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা সবকিছুকেই তারা একজন বর্বর ব্যক্তির (!) চিন্তা-চেতনা বলে প্রচার করে। এই খৃষ্ট জগতের উদ্ভাবিত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদর্শকে ধার করে এনে মুসলিম বিশ্বের তথা কথিত যে সমস্ত প্রগতিবাদীরা রাজনীতি ও সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন করছেন তাদের মুখেও তোতা পাখির মত এই 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' শব্দগুলি খইয়ের মত ফুটতে থাকে। আমাদের দেশের মুসলিম নামধারী ইসলাম বিদ্বেষী চক্রতো আরেক কাঠি সরেস। পাশ্চাত্যের লোকেরা মুসলমানদের নিকট থেকে ইসলামের দাওয়াত বাদে সকল কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রগতিবাদীরা ভাল মন্দ বিবেচনা না করেই কারিগরি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে সংস্কৃতি ও ধর্মীয় তত্ত্বও ধার করে এনেছে। ওরা প্রভুদের মুখে শোনা 'মৌলবাদ' আর 'মধ্যযুগীয় বর্বতা' প্রভৃতি খিস্তির মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের গাল-মন্দ না করতে পারলে মনে শান্তি পায় না। ওরা জেনে শুনেই কোন কোন প্রভুভক্ত জানোয়ারের ন্যায় ইসলামের নবীকে একজন বর্বর ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে নিজেদের মহামানব হিসেবে জাহির করতে চায়, নিজেদের মনগড়া মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলামকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা হিসেবে প্রচারণা চালাচ্ছে।

তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ওই যুগকে বর্বরতার যুগ বলে যে দাবী করছে তার অসারতা প্রমাণে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। কেননা, ছাগলকে কান ধরে বার বার বোঝানোর পর কান ছেড়ে দিলেই সে কান দুলিয়ে মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় সে বুঝতে মোটেই রাজি নয় অথবা সে বুঝেনা, কেননা সে ছাগল। সুতরাং আমরা ও পথে না গিয়ে এই প্রগতির যুগের ভদ্র মানুষের দাবীদারদের মানবিক মূল্যবোধ ও চারিত্রিক মহত্ব সম্পর্কে একটু আলোকপাত করব। বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারময় যুগ হিসেবে পরিচিত রাসূল (সঃ)-এর জন্ম গ্রহণের সময় থেকে এক শতাব্দী পূর্ব সময় পর্যন্ত। যে সময়কে আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ বলা হয় সে সময়কার মানুষদের চরিত্রের সাথে এদের চরিত্রের একটু তুলনা করলেই এই ভদ্রদের মুখোশ খুলে যাবে।

সেই জাহেলিয়াত যুগে নেতা নির্বাচিত হত বীরত্ব, সাহসিকতা, প্রজ্ঞা, বয়জেষ্ঠ্যতার ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু আধুনিক প্রগতিবাদীরা নেতা নির্বাচন করে ভোটচুরি, সন্ত্রাস, ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে। এক টাকার বিড়ি সিগারেট, এক কাপ চা বা একটি রসগল্লার বিনিময়ে তারা ভোট বিক্রি করে দেয়। এই ভোট প্রক্রিয়ায় জাল ভোটের সুবাধে মৃত ব্যক্তিও কবর বা শশ্মান থেকে ভোট প্রদান করতে পারেন। লোকটি কতখানি সৎ তার নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হল লোকটি ভোট কিনে, ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে যে ভাবেই হোক বেশী ভোট পেল কিনা তাই। সে-ই নির্বাচিত হন জননেতা। এ সুযোগে একজন পতিতাও হতে পারে সংসদ সদস্যা।

সে যুগের মানুষ মাস্তানী, ছিনতাই, চাঁদা আদায়, ভোটচুরী, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি কায়দায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সাথে পরিচিত ছিল না। কিন্তু তথাকথতি প্রগতিবাদীরা এই সভ্য যুগে আমাদের এই সব কলা-কৌশল উপহার দিয়েছে। ছাত্র রাজনীতির নামে লাশের রাজনীতি ওই সভ্যদের নয়া আবিস্কার। যা দেখলে জাহেলি যুগের মানুষরাও শিউরে ওঠত। ঐ যুগের মানুষরা একত্রে ৩/৪ জন বা তারও বেশী স্ত্রী রাখত এবং ইচ্ছে মাফিক যাকে খুশী পরিত্যাগ করত। কিন্তু সভ্য দুনিয়ার সাদা চামড়ার মানুষরা সে রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। এখন ওদের পথে ঘাটে যাকে খুশী ভোগ করা ফ্যাসনে পরিণত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে ১৪ বছর বয়সের বেশী বালিকারা কুমারী থাকলে তাদের ঘৃণার পাত্রী হতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৬ জনের একজন জারজ সন্তান। এখানে সন্তানের পিতৃ পরিচয় নির্ণয় করা যায় না বলে সন্তানকে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতে মাতৃ পরিচয় দেওয়ার প্রচলন করা হয়েছে। আমাদের দেশের উগ্র নারীবাদীরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে 'নারী স্বাধীনতার' শ্লোগান দিয়ে থাকেন। আবার দেখা যায় এরাই স্বামীর সাথে সাথে ড্যান্স ফ্লোর, নাইট ক্লাব, প্রমোদ তরী, হোটেল বারে পর পুরুষের সঙ্গ দিচ্ছেন। গাড়ীর চাবির ন্যায় স্বামীরা এসব স্ত্রীদের অন্যের নিকট বদল করছেন অনুষ্ঠান আয়োজন করে। নারী বিকিনি পরে সাতার কাটছে, সুন্দরী নারী মডেল হচ্ছে খোলা পোষাকে, বিলাশ বহুল পতিতালয় স্থাপন করে এই প্রগতিবাদীরা পতিতা বৃত্তিকে একটা শখের পেশা হিসেবে গ্রহণ করছেন। অফিস-আদালতে বড় বসের প্রাইভেট সেক্রেটারী সুন্দরী নারী ছাড়া চলে না। আর এসব প্রাইভেট নারীরা রক্ষিতার ন্যায় বসের সকল চাহিদা পূরণ করে চলছেন। নারীকে সমান অধিকার দেয়ার কথা বলে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার নামে এই মুখোশধারী ভদ্র জাহেলরা শুধু ভোগের জন্য নারীকে যেভাবে ব্যবহার করে, স্বল্প বসনে সাজিয়ে নিজের 'চাওয়া-পাওয়ার চৌহদ্দিতে যে কায়দায় হাজির রাখেন তা' সে যুগের মানুষরা কল্পনাও করতে পারত না। আধুনিক নারীরা প্রগতি আর আধুনিকতার যাতাকলে যে ভাবে নির্যাতিতা হচ্ছে, পুরুষের ভোগের পণ্যে পরিনত হচ্ছে সে যুগে এর শতাংশ ভাগ নির্যাতনও নারীদের ওপর হত কিনা সন্দেহ। হলিউড, বোম্বে-মাদ্রাজ সহ পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে উৎপাদিত নীল ছবির মাধ্যমে যে অগণিত নারীকে জঘন্য কায়দায় পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় এর মত জাহেলিয়াত কি

কোন কালেও ছিল? বিশ্বের সিনেমা নামক রঙ্গ জগতের নায়িকারা স্কাণ্ড্যাল সৃষ্টি করে নারীত্বের যে চরম অবমাননা করে নারীর এমন অবমাননা আর কোন কালে কি ঘটেছিল? পাশ্চাত্যের প্রতিটি নারী এক একটা কলগার্লে পরিণত হয়েছে। নৈতিকতা, নারীর সতীত্ব সর্বোপরি লজ্জার এমন মর্মান্তিক দাফন ঐ জাহেলিয়াত যুগেও সংগঠিত হয়নি। অথচ প্রগতিবাদী–বাদীনীরা এহেন সতীত্ব হরণ, নারী নির্যাতনকে জুলুম না বলে বলেন এ্যাডভেঞ্চার বা 'নারী স্বাধীনতা'।

সে যুগের মানুষরা যুদ্ধ করত তরবারী, বর্শা, ঢালের মাধ্যমে। ফলে কেবল যুদ্ধের সাথে জড়িত ব্যক্তিরাই নিহত বা আহত হত। কিন্তু আধুনিক সভ্যরা দেশের সিংহভাগ মানুষকে অভুক্ত, অশিক্ষিত রেখে বানাচ্ছে পারমানবিক বোমা, কামান, মিজাইল। এর দ্বারা হিরোসিমা, নাগাসাকি ও ইরাকের ন্যায় লাখ লাখ নিরাপরাধ মানুষকে একসাথে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

এই সভ্য যুগেই সভ্য মানুষরা দু' দুবার বিশ্ব যুদ্ধ বাঁধিয়ে কোটি কোটি মানুষ হত্যা করেছে। মানবতার এমন ধ্বংস তাণ্ডব জাহেলী যুগের মানুষরা কি কল্পনাও করতে পেরেছে? এমন ধ্বংসাত্মক সমরসজ্জা দেখে তো সে যুগের মানুষরাও ভয়ে শিউরে ওঠতো।

জাহেলীয়াত যুগে থানা, পুলিশ, ব্যাঙ্ক, টেন্ডার, শিল্প–কারখানা, কোম্পানী, কাস্টমস–ক্লিয়ারেন্স, প্রভৃতি ছিল না ফলে তখনকার দিনে কমিশন, ঘুষ, দুর্নীতি, দালালী, সেলামী, তদবির প্রভৃতিরও অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু আজ দুর্নীতি হচ্ছে ভদ্র মানুষদের নীতি, তাদের মান–ইজ্জত প্রতিপত্তি ও সম্পত্তি। ঘুষ না হলে আজ কোন অফিসের দারোয়ানও অফিসে ঢুকতে দিতে চায় না।। ফাইল–টাইলের ব্যাপার স্যাপারতো বাদ। আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতির পরাশক্তি জাপানের কোন সরকারই স্থায়ী হতে পারছে না এই দুর্নীতির ঠ্যালায়, কয়েক মাস যেতে না যেতেই সরকার বদল হচ্ছে পোশাকের ন্যায়। জার্মানী, ইটালী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্রের বিগত অধিকাংশ সরকার প্রধানই এই দোষে দুষ্ট। অথচ এরাই নিজেদের সভ্যতার শিখরবাসী বলে দাবী করে। আধুনিক থানা পুলিশের কেরামতিতে বিচারক মজলুমকে সাজা দেয়। কখনো টাকার বিনিময়েও বিচারের রায় বিক্রি হয়ে যায়।

সে যুগের মানুষরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করতো। কিন্তু এ যুগে কি কম হচ্ছে? প্রতিটি আদালতে হাজার হাজার মামলা ঝুলে আছে। আর এসব মামলায় জড়িত ব্যক্তির সংখ্যা কত হবে?

জাহেলি যুগের মানুষ আর যাই হোক দেশ এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। তারা ছিল দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু আধুনিক প্রগতিবাদীরা? মাশাআল্লাহ্, পকেটে কিছু মালপানি পড়লে তারা পারলে দেশটাকে ঝুড়িতে ভরে শত্রুর হাতে তুলে দিতে কসুর করে না। এ ব্যাপারে তারা খুব বেশী পাঁকা।

উদাহরণ দিলে আধুনিক সভ্য মানুষদের কীর্তির মহাগ্রন্থ রচনা করতে হবে। প্রতিনিয়ত ওরা মহা–অপরাধ সংঘটিত করে চলছে আর তা অনায়াসে প্রগতি আর আধুনিকতা বলে চালিয়ে দিচ্ছে। ওদের শয়তানী, ওদের প্রতারণা, ওদের পশু চরিত্রের প্রতি রুচিশীল মানুষ ধিক্কার জানালে ওরা তাদের "মধ্য যুগের বর্বর" বলে আখ্যায়িতকরে।

মূলত পৃথিবীতে যা' কিছু ভালো, যতটুকু সত্য ও ইনসাফ কায়েম হয়েছিল তা' এই মধ্য যুগেই কায়েম হয়েছিল। কিন্তু ইবলিসী শক্তি প্রবল হওয়ায় এখন সত্য ও ন্যায়ের পথ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এই ইবলিসী শক্তির কারণে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় আমাদের দেশেও ভালোর অপেক্ষা মন্দ প্রধান্য পাচ্ছে। অপশক্তি উদ্যত হয়েছে সবটুকু সত্য ও ইনসাফকে মুছে ফেলতে। তাই ওরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, প্রতিটি অঙ্গনে কাজের চেয়ে অকাজের অনেক কিছু বিনির্মাণ করেছে, করছে।

এই সব জাহেলদের ধ্বংস করতে হবে। জাতিকে মাথা উঁচু করে দাড়ানোর জন্য ওদের সকল জাহেলী চিহ্নকে ধ্বংস করতে হবে। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার তাগিদে গড়া নয় ধ্বংসের মন্ত্রে এখন দীক্ষা নিতে হবে। কেননা সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এসব জাহেলিয়াত ধ্বংস না করে উপায় নেই। এসব জাহেলিয়াত ধ্বংস হলেই কেবল সত্য ও ন্যায়ের যন্ত্র বাধাহীনগতিতে চলতে পারবে। এর জন্য চাই ইনকিলাব, চাই বিপ্লব, চাই আমূল পরিবর্তন, চাই বিধ্বংসী মিথ্যা তেজোদ্দীপ্ত যৌবন শক্তি। এজন্য রাজপথে ঢেলে দিতে হবে বুকের তাজা রক্ত। আর সেই রক্তে শিক্ত হয়েই অঙ্কুরিত হবে বিপ্লবের চাড়া গাছ। কোথায় সেই অকুতোভয় নওজোয়ান, যার রক্তের কণিকায় কণিকায় সুপ্ত হয়ে আছে বিপ্লবের আগুন?

কাদিয়ানীদের কালো হাত

(১৯ পৃঃ পর)

ছিল। এ সমস্ত খিদমত আঞ্জাম দিতে পারায় আমি গর্বিত। বৃটিশ ইণ্ডিয়ার কোন মুসলমানই আমার খিদমতের নজির দেখাতে সক্ষম হবে না।" (সেতাবায়ে কায়সারাহ পৃঃ–৭)

"আমি আরবী, ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় বহু পুস্তক রচনা করে তাতে লিখেছি যে, অনুগ্রহ দাতা বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সাথে জিহাদ কিছুতেই দূরস্ত নেই; বরং খাটি মনে ইংরেজ সরকারের আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্যই ফরজ।"

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো কাদিয়ানীর স্বরচিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া। সুতরাং বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ যে নবী দাবীর জন্য কাদিয়ানীকে নির্বাচিত করেছিল তা বুঝতে আর বাকী থাকার কথা নয়। [অসমাপ্ত]

ইসলামে নিবেদিত নিপীড়িত মানুষের ফরিয়াদ

কাজী হাস্সান

আধুনিক বিশ্বের বিশাল এক সংগঠন হল রাষ্ট্র। মানুষের সমাজবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের প্রয়োজনে এই সংগঠনের উদ্ভব। রাষ্ট্র নামক সংগঠনটিকে যারা পাচিলনা করেন তাদের সরকার বলা হয়। কোন দেশের সকল মানুষের পক্ষে সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয় যদিও এ অধিকার সকলের আছে। তাই রাষ্ট্রের নাগরিকগণ কিছু সংখ্যক লোককে এই দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। আর এই দায়িত্ব প্রাপ্ত লোকগণকে নিয়েই গঠিত হয় সরকার। এই সরকারের সদস্যরা দেশের মালিক বা রাষ্ট্রপ্রভু নন। তারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি সেবক মাত্র। দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অভাব পূরণ, সামাজিক সমস্যা সমাধান, জীবনের নিরাপত্তা বিধান, তাদের মৌলিক অধিকার পুরণ ও রক্ষা করা অর্থাৎ জনকল্যাণ সাধনই এই সরকার গঠনের মুল উদ্দেশ্য।

সরকারের সদস্যরা জনগণেরই একটা অংশ। তাই এরা জনগণের সুখ-দুঃখেরও সম-অংশীদার। দেশের মানুষ যদি অনাহারে কষ্ট পায় তবে তারাও অনাহারী থাকবে। দেশের মানুষের যদি বস্ত্র না থাকে তবে তাদেরও বস্ত্রের অভাব ভোগ করতে হবে। মোটকথা, রাষ্ট্রের জনগণের অপেক্ষা সরকারের সদস্যরা কখনই অধিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকারী নয়। যদি রাষ্ট্রের জনগণ ক্ষুধার্থ থাকে, বস্ত্রের অভাবে, ঔষধের অভাবে, বাসস্থানের অভাবে কষ্ট পায়, অপরদিকে শাসক শ্রেণী একই সময়ে প্রসাদোপম অট্টালিকায় বাস করে, ভুরি ভোজনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে, চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক ও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে তা' নিশ্চয়ই জুলুমের নামান্তর। এমন শাসক শ্রেণী জনগণের দেয়া দায়িত্বের খেয়ানতকারী ও জালিম বই কি?

আমাদের এই বাংলাদেশের বয়স বাইশ পার হয়ে তেইশে পড়েছে। জনগণ তাদের ভগ্যন্নোয়নের জন্য অনেক সেবক তথা সরকারও নিযুক্ত করেছে। কিন্তু হয়েছে কি ভাগ্যের উন্নতি? সরকার নিয়োগের মুল উদ্দেশ্যটি একটি বারের মতোও কি বাস্তবায়িত হয়েছে? জনগণের প্রতিনিধিরা কি কখনো জনগণের সুখ দুঃখের সম-ভাগীদার হয়েছে? এ প্রশ্নের সমাধান সম্মানিত পাঠকগণের ওপর ন্যাস্ত করলাম।

দীর্ঘ বাইশ বছর শেষে এই ১৯৯৩ সালে দেশে বেকার জনসংখ্যার পরিমাণ দাড়িয়েছে ৩০% অর্থাৎ তিন কোটি ষাট লক্ষ। ভাসমান ও গৃহহীন জনসংখ্যা হল ৬ লক্ষের কিছু বেশী। কম করে হলেও ১০ লক্ষ ভিক্ষুক, অঙ্গহীন, কর্মক্ষমতাহীন--প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছে। পেটের জ্বালায় ঘৃণ্য পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে ৫ লাখ নারী। এ সমস্ত অসহায়, বেকার, কর্মক্ষমতাহীন মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা, সকলের জন্য বাসস্থান, সকলের জন্য ডাল-ভাত সংস্থান করার ওয়াদা দিয়ে দফার পর দফা পেশ করে বহু সরকার ক্ষমতায় এসেছে। অন্য দিকে এসব মানুষের দফা রফাই ঘটেছে ক্রমান্বয়ে। শাসক শ্রেণী একদিকে এসব গাল ভরা বুলি আওড়িয়েছে অন্যদিকে বার্ষিক জমা-খরচের হিসেব তথা বাজেটে এসব মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে।

চলতি বছরের বাজেটের কথাই ধরা যাক। অন্যান্য বছরের বাজেটের ন্যায় এ বাজেটেও দেশের বেকারদের ভাতা প্রদান বা নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, ভিক্ষুক, কর্ম ক্ষমতাহীন, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, ঋণগ্রস্থ, এতিমদের লালন-পালন এবং অভাবগ্রস্থদের সাহায্য করার জন্য আলাদা কোন বরাদ্ধ নেই। অথচ এরাও রাষ্ট্রের নাগরিক। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, তাদের এই মৌলিক অধিকার ও পাওনা পরিশোধ করার দায়িত্ব সরকারেরই। অভাব পূরণের জন্যই এরা সরকার নির্বাচন করে থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যাদের কল্যাণের জন্যই সরকার, সেই সরকার এসব হতভাগাদের দুঃখের কথা ইচ্ছে করেই ভুলে যায়। নিজেদের ইচ্ছেমত দেশ শাসন ও বিচার করার আইন এবং সংবিধান রচনা করে এর সেই সংবিধানের প্রথমেই নিজেদের বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধার কথা লিখে নিয়েছে। হ্যা, বাংলাদেশের সংবিধানের কথাই বলছি। এই সংবিধানের শুরুতেই প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, ফুলমন্ত্রী, হাফমন্ত্রী, সিকি মন্ত্রী, সচিব, আমলাদের দায়িত্ব, অধিকার ও সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যায় রয়েছে তাদের বেতন, ভাতা, চিকিৎসা ও ঐচ্ছিক অনুদানের পরিমাণের বিবরণ। অর্থাৎ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসার অভাবে হাজারো কষ্ট ভোগ করলেও এ সমস্ত পদাধিকারী ব্যক্তিগণ যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন জাতীয় সমস্যার তোয়াক্কা না করেই ততদিন গাড়ি-বাড়ি, চাকর, ড্রাইভার, বেতন, ভাতা অনুদান প্রভৃতি সুবিধা পেয়েই যাবেন। যতই দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা থাক মাস শেষে

বেতন/ভাতা তাদের খাড়া।

তারা যে এর কিছুই পাবেন না তা' নয়। তাদেরও জীবিকা অর্জনের তাগিদে আর্থিক সুবিধার প্রয়োজন আছে। তবে তারও একটা সীমা থাকা চাই। সরকারের সদস্যগণ জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের পর একজন নাগরিকের ভাগে যা' পড়ে তাই ভোগ করতে পারেন, এর বেশী নয়। জনগণকে ভুখা-নাঙ্গা রেখে নিজেদের উদর ভর্তি আর মূল্যবান বসনে আবৃত করার অধিকার কোন শাসকের নেই। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে জাতীয় সম্পদের সুষম বন্টন করে দেয়ার পর তারা যদি ডাল-ভাত খায়, তবে শাসক শ্রেণীও ডাল-ভাত খাবে। সাধারণ মানুষের যদি গাড়িতে চড়ার সামর্থ থাকে তবেই সরকারের সদস্যরা গাড়িতে চড়তে পারেন। প্রতিটি নাগরিকের বাসস্থান সমস্যা সমাধান করে দিয়ে তবেই তারা সরকারী বাড়ি ব্যবহার করতে পারেন। এটাই জন-কল্যাণকামী সরকারের বৈশিষ্ট্য, এটাই ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এর বিপরীত ব্যবস্থাকে কখনো জন-কল্যাণকামী বা ইনসাফ ভিত্তিক সরকার বলা যায় না।

অথচ এই দেশে তাই ঘটছে। কৃষক রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে শস্য উৎপাদন করে, শ্রমিক হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পণ্য উৎপাদন করে আবার তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন উপায়ে ট্যাক্স আদায় করে সরকারের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি এই কৃষক-শ্রমিকের অধিকাংশ নিয়মিত খেতে পায় না, লজ্জা নিবারণের কাপড় সংগ্রহ করতে পারে না, চিকিৎসার ঔষধ নেই, কারখানায় যাওয়ার পরিবহন সুযোগ নেই। কিন্তু তাদের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থে বিলাসী জীবন যাপন করে শাসক শ্রেণী। অথচ শ্রমিক-কৃষক সরকারকে ট্যাক্স দেয় এর বিনিময়ে তাদের ভাগ্য উন্নয়ন ও মৌলিক চাহিদা পূরণ হওয়ার প্রত্যাশায়। কিন্তু তাদের সেই মৌলিক অধিকার দ্বীধাহীন চিত্তে এড়িয়ে যাওয়া হয়। কখনো বা দারিদ্র এবং দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার দোহাইও দেয়া হয়। এই একই ব্যক্তিবর্গ আবার সংবিধান, সংসদকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দরিদ্র, অবহেলিত জনগণের মূল্যবান অর্থ অপচয় করে। শুল্ক মুক্ত গাড়ি, শিতাতপ নিয়ন্ত্রিত মূল্যবান আসবাবপত্র সজ্জিত বাসগৃহ ও অফিসসমূহ ব্যবহার করে থাকে। এভাবে সুকৌশলে সংবিধান ও সংসদকে শাসক শ্রেণী নিজেদের সুযোগ সুবিধা ও বিলাসী জীবন যাপনের হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে। আর্থিক ও জীবন ধারণের সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা হচ্ছে বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর ব্যক্তিত্বের মাপকাঠি। যে যতবড় সরকারী কর্মকর্তা তার তত বড় বাড়ি, তত দামী গাড়ি, অফিস, তত বেশী সংখ্যক চাকর-বাকর থাকা চাই। এভাবে জনগণের অর্থ লুটপাট করে বিলাসবহুল জীবন যাপন করার সুবিধা যে সংবিধানে আইন বানিয়ে আদায় করে নেয়া হয়েছে তাকে মহা-পবিত্র সংবিধান আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর 'বিসমিল্লাহ্‌-- রাহিম" বলেই উদ্বোধন করা হয়েছে এই লুটপাটের সংবিধান।

এই সংবিধান যতদিন অক্ষত থাকবে আর বৃটিশ উপনিবেশিক লুটেরা ডাকাতদের প্রণীত আইন কানুন দ্বারা দেশ শাসিত হবে ততোদিনে এদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি নেই। প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যতই নিত্য নতুন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসুক না কেন লুটপাটের এ ধারাই অব্যাহত থাকবে। কেননা, এই সংবিধানের শুরুতেই তাদের জনগণের সম্পদ যথেচ্ছা অপব্যয় করার সুযোগ দিয়ে রেখেছে। কিন্তু বেকার অসহায়দের বেঁচে থাকার জন্য কোন ব্যবস্থা রাখেনি। এ ব্যবস্থায় জাতীয় সম্পদের সিংহভাগই প্রশাসনের কর্মকর্তাদের লালন-পালনে ব্যয় হয়। সুতরাং সীমিত সম্পদের বাকী ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা বৃহৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন দুরাশাই হয়ে থাকবে। কোন রাজনৈতিক দলের নেতা বা সদস্যদের পৈত্রিক বিশাল সম্পদ রাজি নেই যা দ্বারা এই বিধি-বিধানের আওতায় ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের চেহারা সোনা-রুপো দিয়ে মুড়িয়ে দেবে। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনীতি নিয়ে যারা রাজনীতি করে তাদের বাজেটই হল জনগণ থেকে ট্যাক্স আদায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর হ্রাস, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধি। করের এই বাড়ানো কমানো ভেল্কি খেলার মধ্য দিয়ে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে প্রশাসন পরিচালনাই হল বাজেটের মূল উদ্দেশ্য জনকল্যাণ নয়। এই কর বাড়া-কমার ফলে হয়ত জনগণ একটাকা কম দামে চাল কিনবে, কিন্তু কাপড় কিনতে হবে পাঁচ টাকা বেশী দামে। ফলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সেই একই তিমীরেই থমকে থাকছে। দরিদ্র, কর্মক্ষমতাহীন, মিসকীন, এতিম ও ফকিরদের কথাতো বাদ। তারা যেহেতু কর প্রদান করতে অক্ষম সেজন্যই বোধ হয় তাদের রাষ্ট্রের জন্ম লগ্ন থেকেই অবাঞ্ছিত নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যতদিন দেশের সিংহভাগ এই অবাঞ্ছিত বিবেচিত মানুষের উন্নতির চিন্তা না করা হবে ততদিন দেশের উন্নতির কামনা করাও স্বপ্ন হয়েই থাকবে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ এক হয়েও যদি বাজেট পেশ করে তবুও দেশের অবস্থা তথৈবচ হতে বাধ্য।

ক্ষমতার মসনদে বসে যারা এদেশ গরীব বলে সাধারণ মানুষকে প্রবোধ দিয়ে তাদের পাওনা সম্পর্কে অচেতন রাখতে চায় তারা আসলে এক নম্বর প্রতারক, ক্রিমিনাল। কেউ কি কখনো শুনেছে যে, এদেশ গরীব তাই অমুক মন্ত্রী না খেয়ে মরেছে, অমুক প্রেসিডেন্টের কাপড় কেনার টাকা ছিল না, চটের বস্তা পড়ে অফিস করেছে, কোন আমলা চিকিৎসার অভাবে অমুক সচিব মরে গেছে? এদেশ যদি গরীবই হবে তবে স্বাধীনতার পরে এক হাজার কোটিপতির জন্ম হল কি করে? এরা কি মাটি ফুঁড়ে গজিয়েছে?

মূলতঃ আমাদের এদেশ মোটেই গরীব

নয়। এদেশে যে সম্পদ আছে তা দিয়ে আমরা ভাল ভাবেই খেয়ে পরে বাঁচতে পারি। আমাদের দেশে প্রতি বছর কম করে হলেও দশ হাজার কোটি টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব। এ টাকা সঠিক ভাবে ব্যয় হলে ৪/৫ বছরের মধ্যেই এদেশের বেকার, শ্রমজীবি ও রুজিহীন-মজুর শ্রমিক, কর্মক্ষমতাহীন বা পঙ্গু ও ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিদের সমস্যা দূর করে দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা সম্ভব।

বর্তমানে বাংলাদেশে আনুমানিক সাড়ে চারকোটি বেকার,অসহায়, ঋণগ্রস্থ, ফকির মিসকিন, এতিম ও প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছে। ধরা যাক, প্রতিবছর এই দশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় ১ কোটি মানুষকে ঋণ প্রদান, কারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থান, ব্যবসার মুলধন প্রদান ও বার্ষিক ভাতার ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে দেয়া হল। এভাবে ৪/৫ বছর পরে দেশে অভাবী মানুষের কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে কি? ইসলামী রাষ্ট্র একটি সত্যিকার কল্যাণ ও ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র হবে বলে ইসলাম সমাজের দুস্থ ও গরীবদের আর্থিক সমস্যা দূর করার জন্যই এই যাকাত বিধান প্রণয়ন করেছে। আর এই অর্থ ব্যয়ের জন্য ফকির, মিসকিন, দুস্থ, পঙ্গু, এতিম, ঋণগ্রস্তসহ মোট আটটি খাতকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই আল কুরআনে বিশ স্থানে নামাজ কায়েমের সাথে সাথে যাকাত আদায়েরও কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাকাতের অর্থ-ধনীদের কাছে গরীবদের একটা ন্যায্য পাওনা। এটা ধনীদের অনুগ্রহ বা দান নয়। ধনীরা এ পাওনা শোধ না করলে সরকারের দায়িত্ব তা' আদায় করে গরীবদের বন্টন করে দেয়া।

কিন্তু বৃটিশ আইনের অনুসারীরা ইসলাম অপেক্ষা বৃটিশ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করায় এদেশের গরীবের ভোগান্তি বেড়েই চলছে। যাকাত আদায় ও বন্টনে সরকার যথাযথ দায়িত্ব পালন না করায় এবং যাকাত প্রদানকারীদের সরকারের প্রতি আস্থা না থাকায় গরীব তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে অনাহারে, বস্ত্রাভাবে পথে-ঘাটে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে তাদের পাওনা অর্থ দিয়ে ধনীরা বাড়ি বানাচ্ছে, গাড়ি কিনছে। বিলাসিতায় আকণ্ঠ ডুবে থাকছে তারা। যাকাত খাতের কোটি কোটি টাকা অনাদায়ী থাকায় তা' ধনীদের হাতে থেকে তাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ক্রমশ স্ফিত করছে, বিলাসী বিদেশ ভ্রমণ ও মার্কেটিংয়ে ব্যয় হচ্ছে। জনগনের কল্যাণ করার নাম করে যারা ক্ষমতায় গেলো তারা যাকাত আদায় করে তাদের অভাব পূরণতো করছেই না, উপরন্তু জাতীয় সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা থেকেও তাদের বাদ দেয়া হয়েছে। এদের বাঁচার অধিকার, বাস করার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। রাজপথে ভুখা-নাঙ্গা অসহায় মৃত্যুই এদের পরিণতি হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

তাদের এই অসহায় অবস্থা, করুণ পরিণতি প্রাকৃতিক বা আল্লাহর সৃষ্টি নয়। এটা কৃত্রিম, মানুষের সৃষ্টি। এর জন্য দায়ী সমাজের অর্থ লিপ্সু ধনীরা ও স্বার্থপর শাসকগোষ্ঠী। ধনীরা এদের পাওনা মেরে দিয়েছে—শোধ করেনি, অন্যদিকে সরকার পুঁজিবাদের ফাঁস গলায় পড়ে বিশ্ব ব্যাংক ও বিদেশী এনজিওদের পরামর্শ অনুযায়ী এই ধনীদেরই তোষণকারী বাজেট করছে। এ বাজেটে গরীবের জীবিকার কোন ব্যবস্থা নেই। এটা না করলে নাকি বিদেশী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। তাই জাতিকে আজীবন ভিক্ষুক মানসিকতা সম্পন্ন করে রাখার জন্য একদিকে দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়াচ্ছে অন্যদিকে দেশকে পরনির্ভরশীল করে গড়ে তুলছে।

পূর্বেই বলেছি, এদেশ গরীব নয় এবং বর্তমানে দেশে যে সমস্ত মানুষ দুস্থ ও গরীব রয়েছে তাও প্রাকৃতিক নয়, মানুষের সৃষ্টি। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ধনীদেশ বা এনজিওদের কাছে ভিক্ষা চাওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। এর জন্য চাই জন-কল্যাণকামী সরকার, ইসলামী আদর্শের অনুসরণ, সৎ ও বিবেকবান নেতৃত্ব। দেশের জনগণ শাসকের চরিত্রে রঙিন হয়। শাসক যদি ন্যায়পরায়ন হয়, তবে জনগণও ন্যায়পরায়ন, সৎ ও ভালো হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে শাসক যদি খারাপ চরিত্রের জালিম হয়, তবে জনগণও অসৎ ও উশৃঙ্খল হবে। এটাই বাস্তব সত্য। শাসক যদি জনগণের কল্যাণ চিন্তা করে তবেই জনগণের কল্যাণ হবে,নতুবা নয়।

বসনিয়ার আহবান

(৯ পৃঃ পর)

ভাবো। তারা বাচ্চাদের লালন পালন করবে কি করে? এ অবস্থায় কি তাদের চিন্তার অবকাশ আছে যে, তার সন্তান খৃষ্টান হবে না মুসলমান হবে? অথচ ভবিষ্যতে এই শিশুরা খৃষ্টানদের কাতারে সামিল হয়ে আমাদেরই বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

প্রশ্নঃ বিশ্ব মুসলিম যুবকদের প্রতি আপনার কোন পয়গাম আছে কি?

উত্তরঃ আমাদের দ্বীনি ভাইদের এই কঠিন বিপদের দিনে প্রত্যেক মুসলিম নওজোয়ানের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া ফরজ। এখানের লড়াই আমাদের ঈমানী লড়াই। মিথ্যা ও বাতিলের বিরুদ্ধে সত্য ও ইনসাফের লড়াই। ক্রুসের সাথে ইসলামের লড়াই। সমগ্র খৃষ্ট জগত সার্বিয়ানদের মদদ যোগাচ্ছে ইউরোপ থেকে মুসলমানদের উৎখাত করার জন্য। সুতরাং আমাদের ঈমানী ভাইদেরও এখন একান্ত কর্তব্য বসনিয়ান ভাইদের সব রকমের সাহায্য প্রদান করা। যাতে তারা খৃষ্টান জগতের চ্যালেঞ্জ ও বাতিল শক্তির ঐদ্ধত্য চূর্ণ করে ইউরোপের বুকে টিকে থাকতে পারে।

অনুবাদঃ ফারুক হাসান

হাফেজ্জী হুযূর (রাহঃ)-এর স্মরণীয় বাণী

- এক নিশ্বাস সময়ের দাম এই পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে বেশী।
- মানুষের জন্য আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠ নেআমত হলো সময়।
- এই যিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করা উচিত।
- নেক আমলের ভিতর দীর্ঘজীবন কাটাতে পারলে তার দাম অনেক বেশী।
- আল্লাহ্ পাকের কাছে দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের সব রকম শান্তির জন্য দরখাস্ত করা উচিত।
- নেক আমলের নিয়্যতে দীর্ঘ জীবন কামনা করা ভালো।
- যে কোন কাজ করার সময় আল্লাহ্ পাকের ধ্যান ও খেয়াল দিলের মধ্যে রাখতে হবে।
- যে ব্যক্তি যে কাজে নিয়োজিত তার সেই কাজ একান্ত মনোযোগের সাথে করা উচিত।
- এই যুগে ফিৎনা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন; কিন্তু একান্ত জরুরী।
- নেক কাজের ইরাদা খুব বেশী বেশী করা উচিত।
- প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন কোন একটি মুহূর্ত বৃথা না যায়।
- যাহেরান সকলের সাথে মিশতে হবে, কথা-বার্তা বলতে হবে, কাজ কর্ম করতে হবে, কিন্তু বাতেনান সব সময় আল্লাহ্ পাকের ইয়াদ দিলে-মুখে জারী রাখতে হবে।
- কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা শাহেন শাহী আমল।
- দ্বীনের কাজ কেউ মিটিয়ে দিতে পারে না, যে মিটিয়ে দিতে চায় সেই বরং ধ্বংস হয়ে যায়।
- যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য দুনিয়াকে কামাই করে সে দুনিয়াদার নয়, সে দ্বীনদার আল্লাহ্ ওয়ালা হতে পারে।
- যে ইল্ম দ্বারা আল্লাহ্ পাকের ভয় ও আযমত পয়দা হয় না, তা জাহিলিয়াতের শামিল।
- দিলে সব সময় আল্লাহ্র যিকর জারী রাখতে হবে।
- অজুর সাথে সব সময় থাকার জন্য গুরুত্বের সাথে চেষ্টা করতে হবে।
- কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাজ করতে হবে। যেটা খুব বেশী জরুরী সেটা আগে করতে হবে। তারপর যেটা কমজরুরী সেটা করতে হবে।
- হিম্মত করলে আল্লাহ্ পাকের মদদ হয়।
- বৃদ্ধকাল আসার আগে জওয়ান বয়সে কাজ করা উচিত।
- যেটুকু ইল্ম হাসিল হয় সেটুকু ইল্ম সঙ্গে সঙ্গে আমলে পরিণত করুন।
- কিমাত বাড়বে আল্লাহ পাকের ফরমাবরদারী করলে, হুযূর (সঃ)-এর অনুকরণ করলে এবং নেক আমল করলে।
- পরস্পরে দেশ, ভাষা ও গোত্র হিসেবে ঘৃণা বা হিংসা করা উচিত নয়।
- আসাতিজায়ে কেরামে ও তোলাবাদের সব চেয়ে বড় ইবাদত হলো ইল্ম শিক্ষা দেয়া ও ইল্ম শিক্ষা করা।
- অনর্থক কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।
- সব সময় নজর 'বর কদম' অর্থাৎ চলার সময় নিজের দিকে নযর রেখে চলতে হবে।
- অপ্রয়োজনীয় কোন কিছুর দিকে অনর্থক চোখের দৃষ্টি দেয়া উচিত নয়।
- এ দুনিয়া চাষাবাদের জায়গা। এতে যেমন আবাদ করা হবে তেমন ফসল পাবে।
- যার যেমন আকল তাকে তেমনভাবে বুঝানো উচিত
- এ দুনিয়া থাকার জায়গা নয়; থাকার জায়গা বেহেশ্ত।
- ছাত্রদের কাজই হল লেখাপড়া করা।
- প্রত্যহ একঘন্টা করে নির্জনে বসে শুধু 'আল্লাহ-ই আল্লাহ্' এই খেয়ালে 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির করবে।
- আসাতিযায়ে কিরাম ও তোলাবাদের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত আদায়ের পর কিতাব নিয়ে ব্যস্ত থাকাই আসল কাজ।
- ভালোভাবে লেখা পড়া করাই ছাত্রদের বড় রাজনীতি।
- মানুষের জীবনে সময় খুবই কম, কিন্তু কাজ অনেক বেশী; কাজেই সবসময় কাজে লিপ্ত থাকতে হবে।
- উস্তাদের কথার দিকে একাগ্রচিত্তে খেয়াল করে পড়া শুনলে পড়ায় বরকত হয় এবং সহজে পড়া বুঝে আসে।
- কান দ্বারা কোন বাজে কথা শুনও না।
- কওমী মাদরাসাগুলো হলো দ্বীন রক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।
- মুখ দিয়ে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা বের করা অনুচিত।

- দিলে সব সময় ভয় ও আশা দুটোই রাখতে হবে।
- আল্লাহ পাক কাউকে কোন কাজের দায়িত্ব দিলে তাকে সেই কাজ পরিচালনার ক্ষমতা ও বুদ্ধিদান করেন।
- সবচেয়ে বড় আদব হল আল্লাহ পাকের আহকাম মত চলা।
- মজলুম হিসেবে অভিযোগ বা বিচার প্রার্থনা করা যায়, কিন্তু অন্য কোনরূপ নাশকতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ঠিক নয়।
- সবচেয়ে বড় শক্তিশালী অস্ত্র হলো দোয়া।
- দ্বীনী কাজের খিদমতে সকলেরই শরীক হওয়া উচিত
- যে কোন গুনাহের কাজ এখতিয়ারী (ক্ষমতাধীন) কাজেই হিম্মত করে তা ছাড়তে হবে।
- যারা ব্যক্তিগত জীবন ইসলামী বিধান মত চালায় না তাদের দ্বারা ইসলামী হুকুমত কায়েম হতে পারে না।
- মানুষের সকল নেক আমল আল্লাহ পাকের দান।
- ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা চালানো আমাদের দ্বীনী দায়িত্ব।
- জিহ্বা, চোখ এবং কানের হেফাযত করলে দিলে নূর পয়দা হয়।
- স্বাস্থ্যের হেফাযত করা ওয়াজিব, কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিমিত সময় ঘুমাবে এবং পরিমাণ মত খাবে।
- যিকরের পরিমাণ এত বেশী করা ঠিক নয় যে ফিকর করার কোন সুযোগ না হয়।
- পড়াশোনা থেকে ফারেগ হওয়ার পর তা'আল্লুক মা'আল্লাহ না করে শিক্ষকতা করলে শিক্ষাদানে বরকত হয় না।
- অপ্রয়োজনে জায়েয কথা বললেও দিল মরে যায়।
- যারা কাজের লোক তারা কাজ সম্বন্ধে বেশী কথা বলেন না, শুধু কাজ করে যান।
- এই শরীর আমাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের বিরাট এক আমানত।
- মনগড়া ভাবে কোন কাজ না করে সকল কাজ সুন্নাত মুতাবিক করা উচিত।
- গীবত, শেকায়েত, গোস্বা, অহংকার, হিংসা, ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস গুলো মুজাহাদার মাধ্যমে ত্যাগ করতে হবে।
- প্রত্যহ কাজের পর হিসেব করতে হবে যে, ফরয, ওয়াজিব, ও সুন্নাত কোন আমল ছুটে গেছে কিনা? এবং হারাম ও মাকরূহ তাহরিমী কোন আমল হয়েছে কিনা? একয়টি আমল ঠিক থাকলে আশা করা যায় সে বেহেশতী।
- ইহকালে আমাদের কাজে কোন ছুটি নেই।
- দোয়ার পূর্বে তা কবুল হওয়ার জন্য দান খয়রাত করা ভালো লক্ষণ।
- এ নালায়েকের দ্বারা যদি খেলাফত কায়েমের কাজ না হয় তবে আপনারা দোয়া করবেন, আল্লাহ্ পাক যাকে এই কাজের যোগ্য মনে করেন, তার দ্বারাই যেন এই কাজ সম্পন্ন করান।
- হুকুমতের এসলাহের জন্য দোয়া করা উচিত।
- তাওহীদে পরিপক্কতা অর্জন করা উচিত।
- কোন একটি সময়, নিশ্বাস ও মুহূর্ত যেন যিকর ছাড়া না কাটে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।
- সর্ব স্তরের সকল কাজে আল্লাহ্ তা'আলার আইন কানুন অনুসারে চলা ও চালানোর নাম খেলাফত কায়েম করা।
- রাত্রি জাগরণ না করে কেউ বুযুর্গ হতে পারে না।
- আমাদের উদ্দেশ্য গদি দখল করা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য সারা দেশে সর্বস্তরে ইসলামী বিধান-ব্যবস্থা কায়েম করা।
- দোয়া করে সংগে সংগে এই একীন রাখতে হবে যে, দোয়া কবুল হয়েছে।
- মানুষের জীবনটাই হলো আখেরাত তৈরীর জন্য কাজেই খুব পরিশ্রম করে আখেরাত তৈরি করতে হবে।
- বস্তুত প্রতিটি স্তরের প্রতিটি কাজ খেলাফতের অন্তর্গত।
- টাকা-পয়সা, বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভাব-প্রতিপত্তি, শারীরিক শক্তি অর্থাৎ সর্বরকমের সবকিছু দ্বারাই আখেরাত কামাই করতে হবে।
- দুনিয়া খুব ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতই আসল; কাজেই যার যা আছে তা দ্বারাই আখেরাত তৈরী করুন।
- সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, জেনা ও চুরির মত অপকর্মের সুযোগ বন্ধ করুন। এতে জাতীয় সত্ত্বার মৃত্যু ঘটে এবং ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়।
- পরস্পরে উপদেশ প্রদান করুণ। স্মরন রাখবেন, পরস্পরে উপদেশ প্রদান করা জাতি উত্থানের উত্তম মাধ্যম।
- বিবি-বাচ্চা, চাকর-শ্রমিক তথা পরিবার ও সমাজের সকল অধীনস্থদের সম্পর্কে সজাগ থাকুন, এদের ভালো-মন্দের জন্যে আপনাকেই জবাবদিহি করতে হবে।
- দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে বা কমিয়ে মানুষকে কষ্টে ফেলবেন না। এ কাজ জঘন্নতম অপরাধ।
- হিংসা, বিদ্বেষ, গীবত, মিথ্যা পাপাচার পরিত্যাগ করুন, পরস্পরে আন্তরিকতা, ঐক্য, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তুলুন।
- দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে, ফাঁকি ও ধোঁকাবাজি মনোবৃত্তি পরিহার করতে হবে-এতে কোন কল্যাণ নিহি

(২৮ পৃঃ দেখুন)

মরণজয়ী মুজাহিদ

মল্লিক আহমাদ সরওয়ার

(৫)

আলীর বিজয় অভিযানের খবর চীফ কমাণ্ডারের কাছে পৌঁছলে তিনি আলীকে হেড কোয়ার্টারে ডেকে পাঠান। মারকাজী কমাণ্ডার আলীকে নিয়ে হেড কোয়ার্টারে আসেন। চীপ কমাণ্ডার উঠে দাড়িয়ে আলীকে বুকে চেপে ধরে আনন্দের আতিসয্যে তিনি আলীর গালে চুমু এঁকে দেন। আনুষ্ঠানিক কুশলাদী জিজ্ঞাসার পর হাত ধরে আলীকে কাছে বসিয়ে ঐতিহ্যবাহী 'সিন' চা পান করতে দেন। গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আলীর অভিযানের সকল খবর তিনি তার কাছ থেকে শুনলেন। এর পর বললেন, "আলী! প্রথম দিনই আমি তোমার মধ্যে সাহস ও প্রতিভার আভাষ পেয়েছিলাম। আমি তখনই মনে করেছিলাম এ ছেলে বড় হয়ে একদিন মুজাহিদদের খুব বড় কমাণ্ডার হবে। আজ আমার ধারণা সত্যে পরিণত হলো। তোমার হিম্মত ও বিচক্ষণতা দেখে আমি আনন্দিত। এখন তোমাকে এক জরুরী কমাণ্ডারের দায়িত্ব দিব। আশা করি তুমি তা সফলতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম হবে।

আলী বিনীত ভাবে বললো, "আপনি যে প্রশংসা করেছেন আমি তার যোগ্য নই। তবে আমার ওপর কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করলে আমি অত্যন্ত খুশী হব এবং জীবন বাজি রেখে আমি তা সম্পাদন করতে চেষ্টা করব।" কমাণ্ডার এবার আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "বহুত আচ্ছা। গরদীজ সেনানিবাসে মেজর ফয়ইয়াজ খান নামে একজন অফিসার আছেন—সে আমাদের লোক। তাঁর কাছে আমার এক পয়গাম পৌঁছিয়ে তার জওয়াব নিয়ে আসতে হবে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে একাজ করতে হবে। গরদীজের নিকটবর্তী মারকাজের দু'জন কমাণ্ডারকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা তাকে তালাশ করে বের করত ব্যার্থ হয়েছে। এছাড়া গত দুই মাস ধরে তার সাথে আমাদের যোগাযোগ নেই। হতে পারে তিনি ধরা পড়ে গ্রেফতার হয়েছেন। তার সকল তথ্য জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের বিশেষ গোয়েন্দা সার্ভিসের সে একজন একনিষ্ঠ কর্মী। অতএব বুঝতেই পারছ, তার সাথে যোগাযোগ করার গুরুত্ব কত বেশী। গরদীজ পৌঁছার পূর্বেই তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাবে। এ ব্যাপারে গরদীজ শহরে আমাদের যারা হিতাকাঙ্খী রয়েছে তারা তোমাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবে। এখান থেকে তুমি পাঁচজন মুজাহিদ সাথে নিয়ে গরদীজের নিকটবর্তী ঘাঁটি "মারকাজে হায়দার" পৌঁছবে। সেখানে অস্ত্র রেখে খালী হাতে তোমাকে শহরে প্রবেশ করতে হবে। এই মারকাজের কারো সাথে তুমি তোমার মিশন সম্পর্কে আলাপ করবে না। দুশমনদের গুপ্তচর তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে। যার পরিনামে শহরে প্রবেশের সাথে সাথে তারা তোমাকে গ্রেফতারও করতে পারে।"

মুজাহিদদের এই মারকাজ থেকে ছয়দিনের দূরত্বে গরদীজের অবস্থান। সেখানে পঞ্চাশ হাজার লোকের বসবাস। গরদীজ আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের রাজধানী। সামরিক দিক দিয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

এখান থেকে গরদীজের পথ অত্যন্ত বিপদসংকুল। পথে ঘন জঙ্গল, উঁচু উঁচু পাহাড়। এর মাঝে মাঝে বয়ে গেছে স্রোতোস্বীনী পাহাড়ী ঝর্ণা। উপরন্তু অবিরামভাবে চলছে জঙ্গি বিমানের বোমা বর্ষণ। পথে পথে দুশমনের গুপ্তচর ও সৈনিকদের পোষ্ট তো রয়েছেই। তবে আলীর বিগত পাঁচ বছর এনিয়েই কেটেছে বিধায় তার কাছে এ সফর অতি সাধারণ বলে মনে হল।

আলী ও তার সফর সঙ্গীরা হালকা অস্ত্র, খাওয়ার জন্য শুকনো রুটি, কিসমিস এবং সামান্য বিছানা পত্র নিয়ে এই বিপদসংকুল পথে রওয়ানা হলো। দুই দিন চলার পর এক উঁচু পাহড়ের চূড়ায় উঠে এক গাছের ছায়ায় তারা ঘুমাচ্ছিল। এমন সময় পাহাড়ের অপর পাশ থেকে তারা গড় গড় আওয়াজ শুনতে পায়। আলী সাথীদের নিয়ে দ্রুত একটি পাথরের আড়ালে এসে দাড়ায়। পাহাড়ের নিচের এক গ্রামে রুশ সৈন্যরা প্রবেশ করেছে। ট্যাঙ্ক এবং সাঝোয়া গাড়িতে গ্রাম ভরে গেছে। গ্রামে চরম ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। অধিকাংশ ঘরে আগুন জ্বলছে। বহু নিষ্পাপ সরল মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে জালিমরা।

আলীর মনে সেই দিনের কথা স্মরন হলো, যে দিন রুশীরা আলীর গ্রামে হামলা করে তার মা ও ফুফুকে শহীদ করেছিলো। আলী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তার হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠলো। আলী তার সাথীদের বললো, "আজ আমার কাছে অস্ত্র থাকলে রুশদের হেস্ত নেস্ত করে ছাড়তাম।" তার সাথীরা বললো, "আমরা এখন অন্য মিশন নিয়ে যাচ্ছি, অন্য কোন কাজে জড়িয়ে পড়া আমাদের উচিত হবে কি? চুপে চুপে পথ পরিবর্তণ করে

উদ্দেশ্যের পানে অগ্রসর হওয়াই ঠিক।

আলীর মনে রুশদের দেখতেই শত শিখায় প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। তার মনে পড়ে ওদের খেলনা বোম বিস্ফোরনে ছটফট করে মরে যাওয়া খেলার সাথী সায়েমার কথা। রক্তে লাল হওয়া মা ও ফুফুর লাশ তার চোখের সামনে ভেসে উঠে। তার হৃদয় স্বজন হারা যন্ত্রনা ও তাদের হত্যাকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় ব্যাঘ্র হয়ে ওঠল। সে তার সাথীদের পরামর্শ রদ করে বললো, "চলুন বন্ধুরা, রুশদের বদলা নিয়েই সামনে অগ্রসর হব বলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" একজন মুজাহিদ কথা টেনে নিয়ে বললো, "আমাদর কাছে তো শুধু ক্লাসিনকভ, এদিয়ে কি ভাবে আমরা ওদের মোকাবেলা করব?" আলী মৃদু হেসে বললো, "বন্ধুরা! সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, রাতের অন্ধকারে ওদের সবগুলোকে জাহান্নামে পাঠাবার কৌশল আমার জানা আছে। কোন অস্ত্রের প্রয়োজন নেই।" অন্য মুজাহিদরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিভাবে আপনি এতবড় ঝুকি নিচ্ছেন? আলী ওকথার জবাব না দিয়ে সাথীদেরকে বল্লো, "ওইখানে তিনটি গাড়ি উল্টে পড়ে আছে তোমরা তিনজন যেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওগুলোর টায়ার খুলে ফেলো। আমরা অন্য সরঞ্জাম জোগাড় করে তোমাদের কাছে আসছি।" মুজাহিদরা বুঝতে পারছিল না, আলী এই প্লাষ্টিকের টায়ার দিয়ে ট্যাঙ্ক ও সাঝোয়া গাড়ির মোকাবেলা কিভাবে করবে? তবুও আদেশ অনুযায়ী তারা টায়ার খুলতে চলে যায়। আলী তার অপর সঙ্গীকে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামে চলে আসে। এ গ্রামে মাত্র কয়েকটি বাড়ি। গ্রামটি খুবই ছোট। ধ্বংস করে দেওয়া গ্রামের কিছু লোক এখনও বেঁচে আছে। আলী রাস্তার পাশে চিন্তায় মাথায় হাত দিয়ে বসা এক বৃদ্ধকে দেখে এই গ্রামে কোন দোকান আছে কি না তার কাছে জানতে চাইলো। বৃদ্ধ বললো, এ গ্রামে কান দোকান নেই। পাশের গ্রামে ছিল। সে গ্রামটিও ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে। আলী জিজ্ঞেস করলো, "গ্রামের লোকজন কোথায়?" বৃদ্ধ বললো তুমি যদি এই দেশের অধিবাসী হয়ে থাক তবে তোমার অজানা থাকার কথা নয় যে, কোথায় গেছে এই জনপদের লোকজন। আমরাও চলে যাব। আর থাকবোই বা কিভাবে? আমাদের পাশের গ্রামের দোকান থেকে মুজাহিদরা সওদাপাতি কিনতো বলে আজ সে গ্রামটিও রুশীরা ধ্বংস্তুপে পরিণত করেছে। প্রথমে বিমান দিয়ে বোমা বর্ষণ করেছে এর পর ট্যাঙ্ক নিয়ে এসে পুরো গ্রাম ঘেরাও করে ফেলে। উপর থেকে নিক্ষেপিত বিস্ফোরিত বোমার জ্বলন থেকে রক্ষা পাওয়া ঘরগুলোতে ওরা স্বহস্তে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করেছে। আল্লাহ্ জানেন, ওদের হিংস্র নখরাঘাতে কত নিষ্পাপ শিশু ও অবলা নারী ও আজাদী পাগল পুরুষ শাহাদাত বরণ করেছে। এর পূর্বে এই গ্রামের বহুলোক হিজরত করে অন্যত্র চলে গেছে।

আলী বৃদ্ধকে বললো, আমরা মুজাহিদ, বিশেষ এক কাজের জন্য আমাদের কিছু পুরনো কাপড় ও কেরোসিন তেলের প্রয়োজন।

বৃদ্ধ গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে পুরোনা কাপড় কেরোসিন তেল সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। এক টিন কেরোসিন তেল সে সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। আলী তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললো, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি বহু কষ্ট করেছেন।

আলী ও তার সাথী তেল এবং পুরোনা কাপড় নিয়ে পাহাড়ে চলে আসে। কিন্তু অপর তিন সাথী টায়ার নিয়ে তখনও ফেরেনি। তাই তারা কাপড় ও তেল রেখে অন্যদের সহযোগিতার জন্য ছুটে যায়। সবাই মিলে টায়ার গুলি খুলে পাহাড়ের চূড়ায় তুলে আনে। সন্ধ্যার এক ঘন্টা পর আলী পাহাড়ের ওপর পাশে চলে আসে। চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। রুশ সৈন্যরা সারাদিন ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার পর পাহাড়ের পাদদেশে তাবু খাটিয়ে ক্লান্ত শরীরে বিছানায় ভেংগে পড়েছে। তাদের ট্যাঙ্ক এবং সাঝোয়া গাড়িগুলো তাবুর পাশে দাড়ানো। আলী সব কিছু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর একটি উপযুক্ত ঢালু স্থান নির্বাচন করে সব টায়ার সেখানে জমা করে। এবার পুরোনা কাপড় টায়ারে পেচিয়ে তাতে কোরোসিন তেল ঢেলে দেয়। পেচানো কাপড়ে ভালো করে তেল ঢেলে সে সাথীদেরকে বললো, আমি এগুলোতে ম্যাচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, তোমরা এই পরিষ্কার সোজা ঢালু পথ দিয়ে একটি একটি করে গড়িয়ে দিবে। তারপর এখানে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করা চলবে না। সোজা দৌড়ে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলে যাবে। সেখানে বসে এর ফলাফল স্বচক্ষে দেখতে পাবে। সব টায়ারগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে গড়িয়ে দেওয়ার পর মুজাহিদরা দৌড়ে পাহাড়ের অপর প্রান্তে যেয়ে আড়ালে বসে তাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। জ্বলন্ত টায়ারগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তেই রুশদের তাবুতে আগুন লেগে যাচ্ছে। প্রবল হাওয়া বইতে ছিল। দেখতে না দেখতে এক তাবু থেকে আগুন অন্য তাবুতে ছড়িয়ে পড়লো। প্রচণ্ড আগুন তাবুর আশে পাশে দাড়ানো ট্যাঙ্ক ও সাঝোয়া গাড়িতে লেগে গেলো। ফলে গাড়িতে রাখা গোলাবারুদ আগুনে উত্তপ্ত হয়ে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হতে থাকে। রুশীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দ্বিগবিদিগ হারিয়ে দৌড়াতে থাকে। তারা কিছুই ঠাওরাতে পারছে না যে, কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে এবং কারা করছে। এই আকস্মিক বিপদের মুকাবিলা কিভাবে করবে তা তাদের মাথায় আসছে না। জালিম রুশদের অবস্থা দেখে মুজাহিদরা আনন্দে নেচে ওঠে। কয়েক মিনিট পর বিকট বিকট বিস্ফোরণ হতে শুরু হলে মনে হলো যেন কেয়ামত শুরু হয়েছে। আগুনে রুশদের গোলা-বারুদের গাড়ি জ্বলতে থাকলে তার মধ্যে রাখা ভারী-ভারী গোলা প্রচণ্ড আওয়াজে ফাটতে শুরু করে। আগুনের আলোতে নিচের সব কিছু পরিষ্কার দেখা

যাচ্ছিল। রুশদের দেহ তাদেরই গোলার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় উড়তে ছিলো। রুশদের কয়েকজন অফিসার জীবন বাঁচাতে পাহাড়ের দিকে ছুটে আসলে আলী ও তার সঙ্গীরা সিঙ্গেল সট্ গুলি ছুড়ে ওদের পাখির মত মজা করে হত্যা করে। ওরা গুলি খেয়ে তড়পাতে তড়পাতে পাহারের ওপর থেকে গড়িয়ে নিচের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

হঠাৎ তারা পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। আলী সবাইকে বললো মুজাহিদের কোন গ্রুপ হয়তো অপর দিক দিয়ে হামলা শুরু করেছে। আলী সাথীদের হুশিয়ার করে দিয়ে বললো, সজাগ দৃষ্টি রাখো। বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা আমাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে। আক্রমণ করলে ওদের কেউ যেন জীবিত ফেরত না যেতে পারে। বলতে বলতে কয়েকজন রুশ সৈন্য এদিকে হামলা চালায়। আলী ও তার সাথীরা ক্লাসিনকভের ব্রাশ ফায়ারে তাদের ঝাঝড়া করে দেয়। রুশদের পক্ষ থেকে আর কোন আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। তাদের দম্ভচূর্ণ হয়েছে। সকলের অস্তিত্ব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

নিচ থেকে আর কোন গুলির আওয়াজ শুনতে না পেয়ে আলী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নীচে নেমে আসে। তাবুর নিকটবর্তী হয়ে সে এক ধরণের সংকেত বাজাতে লাগলো। মুজাহিদদের কমাণ্ডার ছাড়া অন্য কেউ সে সংকেতের অর্থ বুঝতে পারবে না। অপর পাশ থেকে তার জওয়াবে বলা হল, আমরা মুজাহিদ। নির্ভয়ে চলে এসো। আলী নীচে এসে মুজাহিদদের সাথে মিলিত হয়। তারা ইতিমধ্যে একশ'র মত রুশ সৈন্যকে গুলি করে মেরেছে। আর সমান সংখ্যক জান বাঁচাবার আশায় মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আগুনে যারা পুড়ে মরেছে তাদের হিসাব তখনও করা হয়নি।

অন্য গ্রুপের মুজাহিদরা আলীকে জানালো, আমারা এদের ওপর আকস্মিক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে আগুনের বড় বড় কুণ্ডলী রুশদের তাবুর ওপর পড়তে দেখলাম। দেখতে না দেখতে সকল তাবুতে আগুন ছড়িয়ে পড়লো। তাদের মজুদকরা প্রেট্রোল ও গোলায় আগুন ধরলো। প্রাণের ভয়ে রুশ সৈন্যরা যে যেদিকে পারলো পালাতে থাকলো। আমাদের মুজাহিদরা পূর্বেই মরিচা বানিয়ে পজিশন নিয়ে বসে ছিলো। রেঞ্জের মধ্যে আসতেই তারা ব্রাশ ফায়ারে দুশমনদের কুপোকাৎ করতে থাকে। বাকীরা অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করেছে। আলী এবার তাদের নিকট আগুনের কুণ্ডলীর রহস্য বর্ণনা দেয়। তার কৌশলের কথা শুনে স্থানীয় মুজাহিদ গ্রুপের কমাণ্ডার তাকে বুকে জরিয়ে ধরে বললো, "যে দেশে আপনার মত নওজোয়ান ও বুদ্ধিমান মুজাহিদ থাকবে সেই দেশের মানুষকে কেউ দাসত্বের শিকল পড়াতে পারবে না।" এর পর মুজাহিদরা মালে গনীমত জমা করলো। দুই শত ক্লাসিনকভ ও তিনটি ট্যাঙ্ক গনীমতে পাওয়া গেল। সতেরোটি ট্যাঙ্ক, পঞ্চাশেরও বেশী ট্রাক ও সাঝোয়া গাড়ি জ্বলে নষ্ট হয়ে গেছে। স্থানীয় কমাণ্ডার আলীকে বললো, আমাদের কাছে নগদ অর্থ নেই, আপনারা মারকাজে চলুন, সেখান থেকে আপনাদের গনিমতের সম্পূর্ণ অংশ আদায় করে দিব। আলী বললো, আমাদের গনিমতের প্রয়োজন নেই আর আমরা কোন লালসায় এ কাজ করিনি বরং আমাদের জরুরী কাজ আছে এখনই আমাদের বিদায় নিতে হবে। আলীর বারবার আপত্তি সত্ত্বেও স্থানীয় কমাণ্ডার সাহেব আলীকে কিছু নগদ টাকা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন।

আমরা যাদের উত্তরসূরী

(২৫ পৃঃ পর)

- অপচয়, অপব্যয় ও আত্মসাৎ রোধ করুন, এতে জাতির অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ নেই।
- দ্বীনী মাদ্রাসা ও কুরআনী মকতব অধিক হতে অধিক সংখ্যায় কায়েম করতে সচেষ্ট থাকবেন।
- কুরআন শরীফের সহী তালীমের ব্যবস্থা করে আগামী বংশধরদের দ্বীন ও ঈমানের হিফাজত করুন।
- ইল্‌মে দ্বীনের সাথে সম্পর্কহীন সরকার কোন ক্রমেই দ্বীন প্রচারের খিদমত আঞ্জাম দেয়ার যোগ্য হতে পারে না।
- মযবুত বুনিয়াদের ওপর যখন ঈমানের মেহনত হবে তখন ঈমানের সুউচ্চ ইমরাতও মযবূত হবে।
- মর্জির বিরুদ্ধে কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে সবর করতে হবে।
- পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলি বর্জন করতে হবে।
- অটল-অবিচল থাকা দ্বীনী আন্দোলন ও ইসলামী জিহাদের রূহানী অস্ত্র।
- নাচ, গান, বেহায়াপনা পরিহার করুন, এসব সমাজ ধ্বংসের মহা অস্ত্র।
- সকলের স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম জীবনের সর্বক্ষেত্রে পালন করতে হবে, মনগড়া রীতিনীতি পরিহার করতে হবে।
- দেশ গড়ার মনোভাব তৈরী করুন, জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার করুন। এতে সকল নাগরিকের হক বা অধিকার রয়েছে।
- আমার ও আপনার সকলের সৃষ্টিগত দায়িত্ব আল্লাহ্‌র খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।
- যিনি আমীর ও মুরুব্বী মনোনীত হবেন, তার পূর্ণ আনুগত্য করা জরুরী। এ মূলনীতির ওপর আমল হলে ইনশাল্লাহ্ কামীয়াবী খুবই নিকটবর্তী।

সংকলনঃ হেদায়েত কবীর

সোনার চেয়েও দামী

কাজী হায়াত মাহমুদ

এক যে ছিলেন মহামানব
সোনার চেয়েও দামী
সৃষ্টি কুলে তাঁহার মত
কেউ নেই আর নামী।
জ্ঞানে, গুণে সেই মানুষটি,
কেমন ছিলেন জানো?
ত্রি-ভূবনে তাঁহার তো আর
নেই তুলনা কোন।
তাঁহার মুখের কথায় সবে,
মুগ্ধ হয়ে যেত।
তাঁহার কাছে এলেই মানুষ
সোনার মানুষ হতো।
জীবনে তাঁর দোষ ছিল না
আমরা সবাই জানি।
তিনি ছিলেন সবের সেরা,
সকল গুণে গুণী।
কাজে কথায় সকলের মন,
জয় করেছেন যিনি।
আর কেউ নন সেই মানুষটি,
বিশ্ব-নবী তিনি।

শুধু ভাবি

মুঃ আঃ গনি খান

তোমার কুদরাতের খোদা কোন সীমা নাই
সারা দিন উদাস মনে ভাবি শুধু তাই।
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা রেখেছ কেমনে ধরে,
যার যে পথে আপন মতে সবাই গমন করে।
তাইতো তাদের চলার পথে সংঘর্ষ না ঘটে,
কুদরাতেরই অন্যতম ভাবি ইহা বটে।
আকাশেতে জ্বলে নিভে তারকা রাজি,
বিজ্ঞানীরা গবেষণা করিতেছে আজি।
কত মানুষ পয়দা করছো দুনিয়ার পরে
কারও সাথে কারও আদল নাহি কভু মিলে।
মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ আসে জন্মিবার আগে,
মাতৃ-পিতৃ স্নেহ ধারা কেমন সুধা লাগে।
ডিমের মাঝে বাচ্চা থাকে, হাওয়া কোথা পায়,
শুকনো বীজে অংকুর আসে তব করুণায়।
নদীর পানি কল কলিয়ে সাগর পানে ধায়,
সাগর পানি কেমন করে বৃষ্টি রূপে আয়।
দারুণ গ্রীষ্মে বহে তব শীতল বাতাস,
মুক্ত করে রেখেছো তুমি অসীম আকাশ।
শ্বাস প্রশ্বাসের লাগি তুমি দিয়েছ সমীরণ,
মোদের তরে সূর্য করে আলো বিকিরণ।
নিয়মিত আলো দেয় রাতের বেলা শশী,
অমানিশার পরে আসে পূর্ণিমার হাসি।
জীবের লাগি দিয়েছো তুমি পিপাসার বারি
মনে মনে ভাবি তুমি কত হেকমতকারী।
তোমার কুদরাত খোদা বর্ণিতে না পারি,
হর হামেশা তাই তব শোকর গোজার করি।

মোরা মুসলিম বীর

মোঃ আঃ হাই তমিজী

মোরা মুসলিম বীর,
মানিনা কোন বাঁধার প্রাচীর।
মানিনা মানিনা কোন মিথ্যার উচ্চশির,
মোরা মুসলিম বীর।
মোরা সত্যের পথ ধরে চলবই।
মিথ্যার জাল ছিড়বই।
আল্লার পথ ধরে চলবই
মিথ্যার প্রাচীর ভাঙ্গবই।
মোরা রাসূলের সিড়ি বেয়ে উঠবই।
মোরা সত্যের বিজয় আনবই।
মানিনা মানিনা কোন মিথ্যার প্রাচীর
মোর মুসলিম বীর।

প্রশ্নোত্তর

• মোঃ আবুল কালাম,
রাজাপুর, ঝালকাঠি।

প্রশ্নঃ *কুরআনে বর্ণিত হযরত খিজির (আঃ) ও হযতর মূসা (আ:)–এর ঐতিহাসিক সফরের এক পর্যায়ে দেখা যায় যে, তারা এক রাস্তা দিয়ে চলার সময় একটি দেয়াল হেলান দেখে খুব কষ্ট করে সেটি সোজা করে দেন। কেননা ওই দেয়ালের নিচে ইয়াতিমের গুপ্ত ধন রক্ষিত ছিলো। কোন কিতাবে দেখা যায়, সেই গুপ্ত ধন ছিল স্বর্ণের একটি ফলক এবং তার ওপর নাকি মূল্যবান কয়েকটি কথা লেখা ছিলো। সেই কথাগুলো কি জানালে উপকৃত হব।*

উত্তরঃ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)–এর সূত্রে একখানা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে নিম্ন লিখিত বাক্যসমূহ লিখিত ছিলোঃ

১। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

২। সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে অথচ দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়।

৩। সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্য জনক, যে আল্লাহ্ তা'আলাকে রিযিক দাতা রূপে বিশ্বাস করে; এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

৪। সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক যে মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখে, অথচ আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে।

৫। সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের হিসাব–নিকাশে বিশ্বাস রাখে; অথচ সৎকাজে গাফেল হয়।

৬। সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে দুনিয়ার নৈত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।

৭। লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

• শিকদার আবুল বাশার
ইছামতি, তেরখাদা,
খুলনা।

প্রশ্নঃ *যে সকল পিতা–মাতা তাদের মেয়েদের গায়রে মুহরিম পুরুষের সাথে কথা বলা ও চলাফেরা করার সুযোগ করে দেয় তাদের কি শাস্তি হবে?*

উত্তরঃ তাদের শাস্তি কত কঠিন ও ভয়াবহ হবে তা কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তবে সমাজের স্থিতিশীলতা, অশান্তি, নৈরাজ্য ও নারীর ইজ্জত হরণের যে অদম্য পশুবৃত্তি চলছে তার জন্য এরাই দায়ী। নারীর প্রতি সহজাত দুর্বল পুরুষের হাতে মেয়েকে ছেড়ে দেয়া মানে তার ইজ্জত লুটে খাওয়ার সুযোগ দেয়া। বহু আহম্মক অবিভাবক এতে এক রকম পৈশাচিক স্বাদ পায়। বর্তমান সমাজ মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ এখানেই। কারন আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা ফরয করেছেন নারীদের ঘর–বন্দী করার জন্য নয়। বরং পর পুরুষের নযর থেকে তাদের রূপ–লাবণ্য আড়াল করে রাখার জন্য। নারীর রূপ–লাবণ্য সস্তা মুলোর মত খুলে রাখার অর্থ যে পুরুষদের যৌবনে সুরসুরি দেয়া তা যে কোন যুবকের বুঝার কথা। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা যে ব্যক্তির নৈতিকতা থেকে সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে এবং এর পরিণামে যে গোটা জাতি আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায় এর প্রমাণ বহু–অসংখ্য। বর্তমান সময়ের 'এইডস' নামক মহামারীর প্রাদুর্ভাবই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব সাবধান।

• মোঃ এমদাদুর রহমান,
জামেয়া লুৎফিয়া হামিদ নগর,
মৌলভী বাজার।

প্রশ্নঃ *জাগো মুজাহিদ গত জুন–৯৩–এর প্রশ্নোত্তর পাতায় একটি জবাবে লেখা হয়েছে যে, "ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ায় এইরূপ কোন প্রসাধনী ব্যবহার করা পুরুষের জন্য বৈধ নয়।" এই তথ্য আপনি কোথায় পেয়েছেন দলীল সহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।*

উত্তরঃ গায়ের রং বা ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষে পুরুষের জন্য এমন কিছুই প্রসাধনী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না যাতে তার ত্বকের কোন অংশের প্রকৃত রং চাপা পড়ে। যেমন মেহেদী বা হলুদ ইত্যাদি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর তথাকথিত রূপচর্চা এক জিনিস নয়। রূপ চর্চাও নিষিদ্ধ নয় তবে পুরুষেরা রূপচর্চার নামে এমন কিছু ব্যবহার করতে পারবে না যাতে বাহ্যত তার ত্বকে কোনরূপ পরিবর্তণ লক্ষ্য করা যায়। কেননা এইরূপ রং লাগানো কেবল মহিলাদের জন্য অনুমোদিত। পুরুষের জন্য অবৈধ। কারণ এর দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে রূপ ও আংগিক সাদৃশ্য চলে আসে। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর জন্য দেখুন ফতুয়ায়ে রশিদিয়ার মেহদী বিষয়ক মাসআলাটি।

• আব্দুল্লাহ্ মোঃ আবেদ ও
আতিকুল্লাহ জুলফিকার,
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ *দাড়ি রাখা কি এবং শরীয়াতের দৃষ্টিতে কতটুকু পরিমাণ দাড়ি রাখা উচিত?*

উত্তরঃ এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এক মুষ্টির চেয়ে বেশী কাটা ও কামান মাকরূহে তাহরিমী।

• হাফেজ মোঃ মনিরুজ্জামান,
খুলনা দারুল উলুম মাদ্রাসা,
জামাতে মেশকাত শরীফ,
খুলনা।

প্রশ্নঃ *হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি কোথা থেকে, কিভাবে হয়েছে। এই ধর্মের প্রবর্তক কে? মূর্তি পূজার প্রচলন কখন থেকে শুরু হয়েছে?*

বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

উত্তরঃ 'হিন্দু' নামে কোন স্বতন্ত্র ধর্মের অস্তিত্বই ইতিহাস ও সমাজ গবেষকগণ স্বীকার করেন না। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু লিখেছেন, "হিন্দু নামে কোন ধর্ম নেই। যারা হিন্দু বা ভারতে বসবাস করে তারা সকলে হিন্দের অধিবাসী বা হিন্দু। যারা দেব-দেবী, ঈশ্বর-ভগবান মান্য করে, তারাও যেমন হিন্দু, তেমনি যারা এসব মান্য করে না তারও হিন্দু। তবে প্রচলিত অর্থে এই উপমহাদেশে মুসলিম, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট পরিচয়ের বাইরে যারা আছে তাদেরকেই হিন্দু বলা হয়।

বস্তুতঃ উপমহাদেশে পৌত্তলিক ধর্ম নিয়ে যারা হিন্দু নামে পরিচিত হয়েছে তারা এদেশীয় নয় বহিরাগত।

নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে বনী ইসরাঈলের একটি শাখা ব্যাবিলনে মূর্তি পূজার প্রচলন করে। এক পর্যায়ে ব্যবিলনে সংঘটিত এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে মূর্তি পূজারীরা পর্যুদস্ত হয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এদেরই একটি শাখা উরাল পর্বতমালা পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তানের পথে এই উপমহাদেশে এসে বসতি স্থাপন করে। এরা আর্যজাতি নামে খ্যাত। এদের দ্বারাই এই দেশে মূর্তি পূজার প্রচলন ঘটে। তবে এর গোড়ায় কার নেতৃত্ব ছিলো, কে সে ব্যক্তি এবং নির্দিষ্টভাবে কোন তারিখ থেকে এর প্রচলন ঘটে তার সঠিক ইতিহাস বলা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে পুংখানুপুংখ আলোচনা ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবুও এ ব্যাপারে সচেতন মানুষের একটা ধারণা থাকা উচিত বলে কিছু লেখা।

• মোঃ জাহিদুল ইসলাম,
জামাতে জালালাইন শরীফ,
দারুল উলুম মাদ্রাসা, মোসলমানপাড়া, খুলনা।

ও

• মোঃ ইস্রাফিল হোসেন,
গ্রামঃ গওহর ডাঙ্গা,
পোঃ খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ

প্রশ্নঃ *বাবরী মসজিদ কত সনে কে নির্মাণ করেন এবং এর আয়তন কত। এই মসজিদটি বিধর্মীদের দ্বারা কতবার আক্রান্ত হয়?*

উত্তরঃ সম্রাট বাবরের ভারত বিজয়ের স্মৃতি হিসেবে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ট জন ও মন্ত্রী মীর বাকীর তত্ত্বাবধানে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে এই পবিত্র মসজিদিটি নির্মিত হয়। ফয়জাবাদ থেকে পাঁচ কিলোমিটার ও দিল্লী থেকে সাত কিলোমিটার দূরে পশ্চিম দক্ষিণ ভারতের অযোধ্যা ভূমিতে দীর্ঘ ৫১৪ বছর এই মসজিদটি অমর স্মৃতি হয়ে মুসলমানদের বিজয় ঘোষণা করছিলো। আটশত বর্গ মিটার জায়গার ওপর মসজিদটি স্থাপিত ছিলো।

কুচক্রীদের প্ররোচনায় এই মসজিদটিকে কেন্দ্র করে প্রথম হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ঘটে ১৮৫৫ খৃঃ। এতে ৭৫ জন লোক মৃত্যু বরন করেন।

১৮৫৭ খৃঃ হনুমানীয় আদর্শে উম্মত্ত এক দল পৌত্তলিক বাবরী মসজিদ চত্তরের একটা অংশকে জবর দখল করে তাকে "রাম চবুতরা" বলে ঘোষণা করে।

১৮৫৯ সালে বৃটিশ সরকার মসজিদ ও রাম চবুতারা (যেখানে হিন্দুরা রামের মূর্তিস্থাপন করে এবং পূজা শুরু করে) এর মধ্যবর্তী স্থানে এটি দেয়াল তৈরী করে।

১৮৮৫ খৃঃ হিন্দুদের পক্ষ থেকে এই দাবী করা হয় যে, এই মসজিদের স্থানে শ্রী রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব মসজিদের সীমানার মধ্যে মন্দির নির্মাণ করার অনুমতি দিতে হবে।

১৮৮৬ খৃঃ থেকে উভয় পক্ষের দাবি পাল্টা দাবীর এক পর্যায়ে ১৯৩৪ সালে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় রামবাদীদের হাতে মসজিদের প্রধান দরওয়াজাসহ বেশ কয়েকটি স্থান ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১৯৩৬ সালে মুসলিম সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়।

১৯৪৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর গভীর রাতে টীকিকাটা ত্রীশুলবাদী গোড়া হিন্দুরা মসজিদের দরওয়াজা খুলে মেহরাবের ওপর রাম ও সিতার মূর্তি স্থাপন করে এবং মসজিদটিকে তারা জবরদস্তি দখল করে নেয়।

বহু ঘটনার পর ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বর্বর পৌত্তলিক হিন্দুদের হাতে এই ঐতিহাসিক মসজিদটির শাহাদাত ঘটে।

• এম, এম, এ কাদের

প্রশ্নঃ *স্বামী যদি গান শুনে (যে গান বাদ্য বাজনা সহ পরিবেশিত হয়) তবে সে কি কাফের হয়ে যাবে? যদি কাফের বা বেঈমান হয় তবে তার স্ত্রী কি তালাক হয়ে যাবে? স্ত্রী যদি এ কারণে তালাক হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর মিলনের ফলে যে সন্তান জন্ম নিবে সে সন্তানকি অবৈধ সন্তান হিসেবে পরিগণিত হবে না? যদি তাই হয় তবে বাংলাদেশের রেডিও, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে যা পরিবেশিত হয় এবং যার দর্শক ও শ্রোতা এই দেশের সিংহভাগ মানুষ এই সিংহ ভাগ স্ত্রী পুরুষের মিলনের ফলে যে সন্তান জন্ম নিচ্ছে তাদের অবস্থা কি দাড়াবে?*

উত্তরঃ আপনার বহু 'যদি' ও 'এবং' যুক্ত প্রশ্নটি পড়ে থমকে যাওয়ার মত অবস্থা। 'যদি'র ওপর ভিত্তি করে দাড় করানো আপনার বিষয়টিকে 'ভয়াবহ' বল্লেও কিছুই বলা হয় না

কল্পনার সাগর পাড়ি দিয়ে কেউ ওপারে পৌছতে পারে না। কেননা সেটা 'কল্পনা'। বাস্তব হলে চেষ্টা করে দেখা যেত এর দৈর্ঘ ও প্রস্তে কত জায়গা।

আপনার মনের এই কথা সন্দেহ ছাড়া কিছুই নয়—যাকে সোজা কথায় বলে ওয়াসওয়াসা। বুঝি না কোন কারণে এবং কোন যুক্তির ওপর ভিত্তি করে সমগ্র মুসলিম জাতিটাকে অপবিত্র বলে ভাবছেন? বাদ্য যন্ত্র সহ পরিবেশিত গান শুনা হারাম বটে, তাই বলে কি হারাম কাজ করলেই ঈমান হারাম হয়ে যায়? কুরআন ও হাদীসের মতে হারাম কাজ করা মহাপাপ ঠিকই কিন্তু এর সাথে স্ত্রী তালাক হওয়ার প্রশ্ন অবান্তর নয় কি? জানিনা, এই পাপগ্রস্থ লোকদের পাপ থেকে বিরত রাখার পথ আবিষ্কার ও তাদেরকে সৎ পথের সন্ধান ও পরকালের ভয়াবহ শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা সত্রিই দুঃখজনক এবং নির্মম। বাস্তবেই যদি আপনার চিন্তা ও ধারণা উল্লেখিত রূপ হয় তবে তা নিসন্দেহে কঠিন পাপ।

আপনিও তওবা করুন।

• মোঃ হাবিবুল্লাহ
জামেয়া ইসলামিয়া
লালমাটিয়া, মোহাম্মাদপুর,
ঢাকা।

প্রশ্নঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে হাবীবুল্লাহ্ এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে খলীলুল্লাহ বলা হয় কেন? হাবীব ও খলীলের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ হাবীব মানে "মাহবুব" অর্থাৎ প্রমাস্পদ এবং খলীল মান 'মুহিব্' অর্থাৎ প্রেমিক। তাই খলীলুল্লাহ্ অর্থ আল্লাহ্র প্রেমিক এবং হাবীবুল্লাহ অর্থ আল্লাহ্ যার প্রেমিক তিনি যাকে ভালোবাসেন। খলীল ও হাবীবের মধ্যে এই হলো পার্থক্য। আর আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে হাবীবুল্লাহ বলা ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে খলীলুল্লাহ বলার এই হলো কারণ।

• শাহ আশেকুর রহমান,
মিতালী ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর,
এয়ারপোর্ট, আম্মরখানা,
সিলেট।

এবং

• মোঃ মিজান,
তালীমুল কুরআন একাডেমী,
কাজল কেন্দ্রীয় মসজিদ,
ডেমরা রোড, ঢাকা।

প্রশ্নঃ মাসিক মদীনা জুন-৯৩ সংখ্যার প্রশ্নোত্তরে দেখলাম, পর্দার হুকুম পালন করে পুরুষের ইমামতিতে মহিলারা জামাতে নামায পড়তে পারেন। অথচ ঢাকার রাজারবাগস্থ একটি গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রচারিত একখানা লিফলেটে দেখলাম, তাতে লেখা হয়েছে যে, "মহিলাদের জামাতের জন্য মসজিদে যাওয়া মাকরূহে তাহরীমী।" মদীনার লেখা অনুযায়ী বিষয়টি জায়িজ প্রমাণীত হয় পক্ষান্তরে রাজার বাগের লিফলেটের ভাষায় সম্পূর্ণ হারাম প্রমাণিত হয়। অথচ একটি বিষয় কখনও একই সাথে জায়িয ও হারাম হতে পারে না। আমরা এখন কোনটি গ্রহণ করব? সঠিক উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

উত্তরঃ মদীনা ও রাজারবাগের বিরোধ নিরসনের দায়িত্ব আমাদের নয়। কোন বিষয়কে জায়িয-নাজায়িয বা হালাল-হারাম নির্দ্ধারণ করার অধিকারও কোন উম্মতের নেই। তবে এই বিষয়ে সাহাবী পরবর্তী সময় থেকেই একটা মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। যার মর্ম উপলব্ধি করতে হলে হাদীস, আছার ও ইমামদের মত-মন্তব্যের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করতে হবে।

প্রথমে আমরা দেখব, এ ব্যাপারে হাদীসে কি বলা হয়েছে। মেয়েদের মসজিদে যাওয়া সম্পর্কে তিন ধরণের হাদীস একই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। এক ধরণের হাদীসে মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ না করতে বলা হয়েছে। যেমন, "তোমরা আল্লাহ্র বাঁদীদের আল্লাহ্র মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।" -(মোসনাদে আহমদ) অন্য একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, "মেয়েরা মসজিদে যাওয়ার জন্যে তোমাদের অনুমতি চাইলে তোমরা তাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিবে।" -(মোসনাদে আহমদ।)

উপরোক্ত হাদীসের ভাষায় বুঝা যায় যে, মেয়েদের মসজিদে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। আর সে অধিকার তারা ভোগ ও ব্যবহার করতে চাইলে তা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখার অধিকার কারো নেই।

দ্বিতীয় ধরনের হাদীসে সুগন্ধি ব্যবহার করে মেয়েদের মসজিদে যেতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে।

আর তৃতীয় ধরণের হাদীসে মেয়েদের নামাযের জন্যে মসজিদ অপেক্ষা তাদের ঘরই শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই সকল হাদীসের আলোকে ও নৈতিক অবনতিশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হানাফী মাযহাবের মনীষীগণ এ ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন।

তাদের কথা হলো, মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়াই হচ্ছে নৈতিক বিপদের কারণ। আর তাই হচ্ছে হারাম কাজের নিমিত্ত। আর যা-ই হারাম কাজ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, তাই হারাম।

এ ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়, যারা এ কাজকে মাকরূহ বলেছেন, সে মকরূহ মানে হারাম। বিশেষ করে বর্তমান যুগ সমাজে। কেননা এ সমাজে বিপদের আশংকা ও কারণ সর্বত্র ও সর্বাত্মক হয়ে দাড়িয়েছে।

তবে ইমাম আবূ হানীফার (রাহঃ)-এর মতে বৃদ্ধা মহিলারা ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযে জামাআতে শরীক হতে পারবে।

ইমাম আবু ইউসূফ (রাহঃ)ও মুহাম্মাদের মতে বৃদ্ধা মহিলারা সব রকম নামাযের জামাআতে শরীক হতে পারবে।

পক্ষান্তরে "মহিলারা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তোমরা তাদের অনুমতি দাও।" রাসূলে করীম (সাঃ)-এর এ বাণীর ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরদ্দীন আইনী লিখেছেনঃ

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মহিলাদের মসজিদে গিয়ে জামাতে নামায আদায় করার অনুমতি দেওয়াই বাঞ্চনীয়। যে কাজে তার ফায়দা তা থেকে তাকে নিষেধ করা যায় না। তবে এ কথা তখনকার জন্য প্রযোজ্য যখন বাইরে গেলে মহিলাদের কোন বিপদ ঘটার কোনই আশংকা বা ভয়-ভীতি থাকবে না।

এ কথার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে হযরত আয়েশার (রাঃ) নিম্নোক্ত বাণীঃ

এ মেয়েরা কি নতুন চাল-চলন গ্রহণ করেছে, এ যদি রাসূল করীম দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি এদেরকে মসজিদে যেতে অবশ্যই নিষেধ করতেন। যেমন নিষেধ করা হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদের।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মুবারক বলেছেনঃ আজকের যুগে মেয়েদের ঈদের নামাযের জন্য বের হওয়া আমি পছন্দ করি না। যদি কোন স্ত্রীলোক বের হতে জিদ ধরে তবে তার স্বামীর উচিত তাকে

অনুমতি দেওয়া এ শর্তে যে, সে তার পুরানো পোশাক পরে বের হবে এবং অলংকারাদি পরে যাবে না। এভাবে বের হতে রাযী না হলে তাকে স্বামী নিষেধ করতে পারবে।

অপরপক্ষে আল্লামা শওকানী বলেন, যারা এ কাজকে মকরূহ বা হারাম বলেন, তাদের কথা মেনে নিলে সহীহ হাদীসকে অযৌক্তিক মত দ্বারা বাতিল করে দেয়া হয়। কেননা সহীহ হাদীসে মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। এজন্য অনুমতি চাইলে স্বামী বা গার্জিয়ান অনুমতি দিতে বাধ্য এবং সে জন্য রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে।

যথা রাসুলে করীমকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "মেয়েরা কি ঈদের জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হবে? তিনি বল্লেন, হ্যাঁ। প্রশ্ন করা হলোঃ যুবতী মেয়েরাও কি? বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই। তার নিজের কাপড় না থাকলে তার কোনও সখীর কাপড় পড়ে বের হবে।"

এসব হাদীস, মনিষীদের অভিমত ও ব্যাখ্যা দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, রাসূল (সাঃ) এ ব্যাপারে নারীদেরকে উৎসাহিত করলেও পরবর্তীকালে সামাজিক পরিস্থিতির অবণতি ঘটার কারণে তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবুও মহিলাদের মসজিদে যাওয়া হারাম বা মকরূহে তাহরিমী হতে পারে না। মকরূহে তাহরিমা হুকুম দ্বারা কাজটা সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। তা কিভাবে হতে পারে। যেখানে মহিলাদের মসজিদে যেতে রাসুলে করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে? অতএব মহিলাদের জন্য মসজিদে জামাআতে নামায আদায় করতে যাওয়া জায়িয। তবে বর্তমান নৈতিক অবনতিশীল পরিস্থিতিতে না যাওয়াই ভালো। কেননা মহিলাদের জন্য জামাআত ওয়াজিব নয়। এটাই আমাদের বিজ্ঞ মুফতীগণের অভিমত।

• হাফেজ মোঃ জামিল (তোহা),
ভাঙ্গা দারুল উলুম মাদ্রাসা,
ফরিদপুর।

প্রশ্নঃ *কোন একজন আলিমের নিকট শুনেছি, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নাকি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। আমি জানতে আগ্রহী যে, তিনি যদি ভারতবর্ষে এসে থাকেন তবে কখন, কিভাবে এবং কোথায় অবস্থান করেছিলেন?*

উত্তরঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বাবেল অঞ্চলের 'কূছা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য এক বর্ণনামতে তিনি বারদানিয়া শহরের 'উর' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

আল্লাহ্‌র অপর কুদরতে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি 'দ্বীনে হানীফ' প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে কালদানী গোত্র পরে মিসর হয়ে সব শেষে ফিলিস্তীনের উপকণ্ঠে উপনীত হন। ১৭৫ বছর বয়সে সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। ইন্তেকালের পর ওই স্থানের হাবরূন-এর 'মাক্কালী' নামক এক গুহায় তাঁকে দাফন করা হয়। উক্ত স্থানটি বর্তমানে "আল-খলীল" নামে পরিচিত। যা মসজিদে বাইতুল মাকাদ্দাস থেকে ১৩/১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

ইতিহাসের কোথাও একথার উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন কি না। ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবনী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনসহ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসেও তার সম্বন্ধে ব্যাপক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু তিনি এই উপমহাদেশে এসেছিলেন কিনা সে কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। মাওলানা সাহেব কোন সূত্রে এই কথাটি বল্লেন তা তাঁর কাছ থেকেই জেনে নিন।।

• এইচ, এম, কাওসার,
গ্রামঃ দৌলতপুর, পোঃ ধরমণ্ডল,
থানাঃ নাসিরনগর, বি বাড়িয়া।

প্রশ্নঃ *কমাণ্ডার শহীদ আব্দুর রহামান ফারুকী (রাহঃ) কত সনে শহীদ হন এবং কিভাবে শহীদ হন। তার শহীদ হওয়ার ঘটনার সময় আর কোন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন কি। আফগানিস্তানের কোন শহরে তাকে দাফন করা হয়েছে তা আমরা জানতে আগ্রহী।*

উত্তরঃ কমাণ্ডার শহীদ আব্দুর রহমান ফারুকী (রাহঃ) ১৯৮৯ সালের ১০ই মে শাহাদাৎ লাভে ধন্য হন। তিনি ওই দিন খোস্ত রণাঙ্গণে এক যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে শত্রু শিবিরের প্রবেশ পথের মাইন তুলতে গিয়ে ইণ্ডিয়ার তৈরী ভয়ঙ্কর পার্সোনাল মাইন বিস্ফোরণে মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং ঐ দিনই শাহাদাৎ লাভ করেন।

তাঁর শহীদ হওয়ার ঘটনায় তাঁর অন্যতম সাথী বাংলাদেশী আর এক মুজাহিদ মাওলানা নূরুল করিম (রাহঃ) শহীদ হন।

আফগানিস্তানের অন্যতম সামরিক গ্যারিসন শহর খোস্তের লিজা নামক স্থানে কমাণ্ডার আব্দুর রহমান ফারুকী (রাহঃ)-কে দাফন করা হয়।

• মোঃ শামসুল হক (শামীম)
চরমোনাই কওমিয়া মাদ্রাসা,
বরিশাল।

প্রশ্নঃ *(১) বার্মা কি কোন দিন মুসলমানদের শাসনে ছিলো। থাকলে কখন তা মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়?*

(২) মসজিদে আক্বসায় এখন কি নামাজ হয়? এটি এখন কাদের দখলে, জানতে চাই।

উত্তরঃ (১) হ্যাঁ, বার্মা প্রায় একশত বছর যাবৎ মুসলমানদের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে বাংলা থেকে গৌড়ীয় সৈন্যরা গিয়ে আরাকানের দখলদার বর্মী সৈন্যদের তাড়িয়ে দেয় এবং স্বাধীন ম্রাউক-উ রাজ বংশের পত্তন ঘটান। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে এই বংশের দ্বাদশ পুরুষ জেবুক শাহ আরাকানের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এই সময়েই তিনি পুরো বার্মাকে আরাকানের অন্তর্ভুক্ত করেন যা' একশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। উল্লেখ্য এই রাজবংশের সকল আমাত্য ছিল গৌড় তথা বাংলার অধিবাসী। গৌড়ের সেনারা গিয়েই আরাকানের সেনাবাহিনী গঠন করেছিল।

(২) মসজিদে আকসা এখন ইহুদীদের কর্তৃক তালাবদ্ধ এবং এর চতুর্দিকে উঁচ দেয়াল ও কাঁটা তারের ঘেরা থাকায় সেখানে কোন নামাজ অনুষ্ঠিত হয় না। তবে মাঝে মাঝে মসজিদটি চত্বরে জুমআর নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এই মসজিদ এখন জায়ানবাদী ইহুদীদের দখলে রয়েছে।

নবীন মুজাহিদদের পাতা

পরিচালকের চিঠি

আস্‌সালামু আলাইকুম

প্রিয় নবীন বন্ধুরা!

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, তোমরা যারা সদস্য কুপন পুরণ করে পাঠাও তার প্রায়টিতেই টিকেট থাকে না। অথচ তোমরা জান যে, টিকেট ছাড়া কুপন গ্রহন করা হয় না। খামের মধ্যে নগদ টাকা পাঠাবে না। বিশ্বাস করি যে, তোমরা কুপনের নিচের অংশটুকু পড়ে তারপরেই তা পূরণ করে পাঠাও। এর শেষের ওয়াদাটি তোমরা যথাযথ পালন করছ কি না আমার সন্দেহ হয়। আশা করি আমার এই সন্দেহ তোমরা অল্প সময়ের মধ্যে দূর করবে।

তবে প্রশ্নের উত্তরের বেলায় যে তোমরা আগের চেয়ে অনেক সতর্ক তা অনুভব করি। এতে তোমাদের আরো বেশী অংশগ্রহণ কাম্য। তোমরা যারা বিজয়ী হচ্ছো তারা নিয়মিত পুরস্কারের পত্রিকা পাচ্ছো কি না জানাবে।

ইতি
পরিচালক ভাইয়া

বলতে পারো?

১। পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কত নম্বর আয়াতটি সর্বশেষে নাযিল হয়েছে এবং তার অর্থ কি?
২। পৃথিবীতে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্রভাবে লিখিত প্রথম সংবিধানটিকে কোন নামে অবহিত করা হয়?
৩। ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ)-এর আসল নাম কি এবং তাঁর প্রধান দুই শিষ্য কে ফিকাহ-এর পরিভাষায় কি বলা হয়?
৪। হাদীসের পরিভাষায় সহীহাইন বলতে কোন কোন হাদীস গ্রন্থকে বুঝায়?
৫। ব্রুনাইর রাজধানীর নাম কি?

সঠিক উত্তর

১। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের সময়।
২। রাসূল (সাঃ)-এর হিজরাতকে কেন্দ্র করে এই সনের উদ্ভব হয় বলে একে হিজরী সন বলা হয়।
৩। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের সময়।
৪। ৬১ হিজরীতে।
৫। মৃত সাগর বা ডেথসী।

সঠিক উত্তরদাতা

১। মোঃ ফজলে এলাহী,
জামেয়া আরাবিয়া এমদাদুল উলুম,
ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪।
২। মোঃ বেলাল হোসাইন (হিজলবী)
জামাতে হেদায়া
চরমোনাই কওমিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল।
৩। আল মুলীল মোঃ হারুনুর রশীদ
আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া
এইচ, এম, এম, রোড, যশোর।

বিঃ দ্রঃ আগামী সংখ্যা থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত উত্তর দাতাদের সাথে সঠিক উত্তরদাতাদের নামও ছাপান হবে।

তোমরা সবাই নবীন মুজাহিদ

১৮৭। মোঃ তাজুল ইসলাম,
ইসলাম পল্টিফার্ম,
কলারোয়া বাজার,
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

১৮৮। হাঃ মিজানুর রহমান,
বাইতুল আমান,
কলেজপাড়া,
পাংশা, থানাঃ পাংশা, রাজবাড়ী।

১৮৯। মোঃ ছাখাওয়াত হুসাইন,
পিতাঃ মাওঃ দেলোয়ার হুসাইন,
জামেয়া মাদানীয়া,
বারিধারা, গুলশান, ঢাকা।

১৯০। হাফেজ মোঃ নাসির উদ্দিন (জামাল),
সাং মালাইর কান্দি,
পোঃ গজরা বাজার,
থানাঃ মতলব, চাঁদপুর।

১৯১। মোঃ আতিকুর রহমান,
হাজী মোঃ ছায়েদুর রাহমান,
পাগার, ফকির মার্কেট,
টংগী, গাজীপুর।

১৯২। হাঃ মোঃ তানবীরুল ইসলাম,
পিতাঃমাস্টার মোঃনজরুল ইসলাম সরকার,
ধোবা ডাংগা,
গোড়গ্রাম, নীলফামারী,
রাজশাহী।

১৯৩। মোঃ ইলিয়াস হোসাইন,
দারুল উলুম মইনুল ইসলাম,
হাটহাজারী,
চট্টগ্রাম।

১৯৪। সাব্বির আল মামুন,
পিতাঃ ক্বারী মাস্টার আঃ খালেক,
ইসলামিয়া মাদ্রাসা, দড়াটানা, যশোর,
ব্লক সি, বাসা নং ২১৬,
উপশহর, যশোর।

১৯৫। মোঃ নজমুল হুদা কুষ্টিয়াবী,
পিতাঃ মোঃ এমদাদুল হক বিশ্বাস,
নওয়াপাড়া জামেয়া আরাবিয়া
মহিউল ইসলাম
পোঃ নওয়াপাড়া, যশোহর।

১৯৬। মোঃ আব্দুল হান্নান,
পিতাঃ মোঃ মোবারক আলী,
নওয়া পাড়া মাদ্রাসা,
পোঃ নওয়া পাড়া,
অভয়নগর, যশোহর।

১৯৭। মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
পিতাঃ মোঃ আবুল হাসান শেখ,
গ্রাম পদ্মবিরলা, পোঃ আমবাড়িয়া,
থানাঃ দিঘলিয়া, খুলনা।

১৯৮। মোহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম
পিতাঃ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম,
গ্রামঃ পাথলিয়া,
পোঃ ও জেলাঃ জামালপুর-২০০০।

১৯৯। মোঃ ফজলে এলাহী আনসারী,
পিতাঃ মোঃ আঃ মাবুদ আনসারী,
গ্রামঃ উত্তর ছায়াবিথি,
থানাঃ জয়দেবপুর, গাজীপুর।

২০০। হাঃ মোঃ অলি উল্লাহ্,
পিতাঃ মোঃ সুরুজ মিয়া,
গ্রামঃ ও পোঃ ধনপতি খোলা,
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

২০১। মোঃ মিজানুর রহমান মুন্সী,
পিতাঃ মোঃ আঃ করিম মুন্সী,
মাদ্রাসা মদিনাতুল উলুম মাশিকাড়া,
পোঃ মাশিকাড়া, থানাঃ দেবিদ্বার,
জেলাঃ কুমিল্লা।

২০২। মোঃ আব্দুর রহীম,
পিতাঃ মোঃ মফিজ উদ্দীন,
মাদ্রাসায়ে মদিনাতুল উলুম
মাসিকারা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

২০৩। মোঃ আবদুল লতীফ,
পিতাঃ মাওঃ মোঃ আব্দুল মালেক,
মাদ্রাসায়ে ইসলামিয়া মদীনাতুল
উলুম মাশিকারা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

২০৪। মোঃ এনামুল হক সরকার,
পিতাঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন সরকার,
মাশিকারা মদিনাতুল উলুম
ইসলামীয়া মাদ্রাসা,
পোঃ মাশিকারা, থানা দেবিদ্বার,
জিলাঃ কুমিল্লা।

২০৫। মোঃ জহিরুল ইসরাম,
পিতাঃ মোঃ মুছলেহ উদ্দিন
সরকার,
মাদ্রাসাই ইসলামিয়া মদিনাতুল
উলুম মাশিকারা,
পোঃ মাশিকারা বাজার,
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

২০৬। খালিদ ইয়াহইয়া,
পিতাঃ ডঃ এ, এইচ, এম,
ইয়াহইয়ার রহমান,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,
কুষ্টিয়া।

নবীন মুজাহিদদের সদস্য কুপন

নাম ---------- বয়স ----------

পিতা ---------- শ্রেণী ----------

পূর্ণ ঠিকানা ----------

আমার বয়স ১৮ বছরের কম। আমি এই পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। নবীন মুজাহিদদের কাফেলায় সদস্য হতে আগ্রহী। কুরআনের আলোকে জীবন গড়তে অংগীকারাবদ্ধ। এই পত্রিকার জন্য প্রতি মাসে অন্তত একজন করে পাঠক সংগ্রহ করব।

স্বাক্ষর

ফিলিপাইনে মুজাহিদ ও সরকারী সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ

ফিলিপাইনের মুসলিম মুজাহিদ ও সরকারী সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াইয়ের খবর পাওয়া গেছে। বিসমিল্ল দ্বীপের সরকারী সৈন্যরা চারটি মুজাহিদ ঘাঁটির ওপর আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে। অপর দুটি ঘাঁটিতে প্রবল প্রতিরোধের মুখে সৈন্যদের ফিরে আসতে হয়েছে। এই আক্রমণে ভারী আর্টিলারী বাহিনীর সাথে ফিলিপিনি বিমান বাহিনীও অংশ নেয়। তারা মুসলিম বসতীপূর্ণ অঞ্চলে প্রচণ্ড বোমা বর্ষন করে। এতে তেরজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন।

ইতিপূর্বে মার্কোস সরকারের পতনের পর মিসেস কোরাজান একিনো ক্ষমতা গ্রহণ করে মুসলিম অধ্যুষিত মিন্দানাও, সুলু এবং অন্যান্য দ্বীপে প্রচণ্ড সামরিক অপারেশন চালায়। এই অপারেশনে অগণিত মুসলমান হতাহত হয়। অবশেষে অন্যান্য মুসলিম দেশের চাপের মুখে ফিলিপিন সরকার সেখানকার মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার মেনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী কালে সৈন্যদের চাপের মুখে সে দাবী পূরণে ব্যার্থ হন। যার ফলে সেখানকার মুসলমানরা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে। চলতি হামলার জন্য একজন খ্রীস্টান পাদরী ও একজন শিশুকে অপহরণের দায়-দায়িত্ব মুসলিম স্বাধীনতা কামীদের ওপর চাপানো হয়েছে। অথচ দীর্ঘদিন ধরে মুলমানদের ওপর যে যুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছে তার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

রুশ সীমান্ত ফাড়িতে তাজিক মুজাহিদদের আক্রমণ

১৬ই জুলাই, মস্কো থেকে রয়টারঃ প্রায় দুইশত তাজিকি ও আফগান মুজাহিদ আফগান সীমান্তবর্তী তাজিক স্থানের এক রুশী সীমান্ত রক্ষী ফাড়ির ওপর আক্রমণ চালায়।

রুশ কমন ওয়েলথ টেলিভিশনের খবরে জানা যায়, এই আক্রোমণে আফগান সীমান্ত থেকে তের কিলোমিটার দূরে একটি ঘাঁটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। সীমান্ত এলাকায় এখনও লড়াই অব্যাহত আছে বিধায় সেখানে আরো রুশ সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ থাকে যে, মুসলিম জাতীয়তাবাদী সরকারকে উৎখাত করে সেখানে পুনরায় কমুনিস্টরা ক্ষমতা দখলের পর হাজার হাজার তাজিক মুসলমান আফগানিস্তানে হিযরত করতে বাধ্য হয়। তাদের মধ্য থেকে মুসলিম যুবকরা সমারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পুনরায় তাজিকিস্থানে প্রবেশ করে সেখানে অবস্থানরত রুশ সৈন্য ও তাদের সহযোগী কমুনিস্টদের সাথে জিহাদ শুরু করে।

কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যদের বিশৃঙ্খলায় সরকার বেসামাল

২৩শে জুন ভারতীয় রেডিও ও দূরদর্শনের খবরে প্রকাশ যে, ভারত সরকার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ডাইরেক্টর জেনারেল ওয়াই এস থাথাকে বরখাস্ত করে সামরিক কোর্টে বিচারের জন্য সোপর্দ করেছে। এছাড়া ডি, আই, জি অশোক পাতিল এবং কমান্ডেন্ট রোহিল পাতিলকে শাস্তি স্বরূপ বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে। এই তিনজন সিনিয়র অফিসারের ওপর মুজাহিদদের কাছে অস্ত্র বিক্রয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিম্ন অফিসার ও সাধারণ কর্মকর্তাদের মুজাহিদদের কাছে অস্ত্র বিক্রয়ের ঘটনা অতি সাধারণ। এর পূর্বেও এ ধরণের বহু ঘটনা প্রকাশ হয়েছে এবং অনেক অফিসারকে এই অভিযোগে চাকুরী হারাতে হয়েছে।

১৯৯২ সনের প্রথম দিকে অস্ত্র বিক্রির অভিযোগে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কয়েকজন অফিসারকে অভিযুক্ত করা হয়। এবার তাদের ডাইরেক্টর জেনারেলকে কোর্ট মার্শালে প্রেরণের মধ্য দিয়ে এ খবরের সত্যতা প্রমাণিত হল যে ভারতীয় সৈন্যরা টাকার বিনিময়ে মুজাহিদদের কাছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করে। এজন্য তাদেরকে সীমান্ত অতিক্রম করে অন্যদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় দূরদর্শনের ও রেডিওর অপর এক খরবে বলা হয় যে, অন্তনাগ (ইসলামাবাদ) জেলার ডেপুটি কমিশনার ও দুইজন সহকারী কমিশনার সহ ছয় জন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে পাঁচ কোটি টাকা জনগণের সেবা মূলক কাজে খচর করার পরিবর্তে আত্মসাৎ ও মুজাহিদদের দিয়ে দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, নিজেদের জীবন রক্ষার তাগিদে তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ মুজাহিদদের তহবিলে চাঁদা প্রদান করেছে। এর দ্বারাই কাশ্মিরী সরকারী কর্মকর্তাদের বিশৃঙ্খলা ও মুজাহিদদের ভয়ে ভীত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাশ্মীরী মুজাহিদরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে

গত পনেরো দিন কাশ্মীরী মুজাহিদরা সরকারী সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে। বারমুলায় মেজর জেনারেল ও কর্ণেলের নিহত হওয়ার খবর বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম সৈন্যদের মনোবল রক্ষার্থে অনেক খবরই অপ্রকাশিত রাখা হয়। তা সত্ত্বেও ১২ই জুন হিন্দুস্তান টাইমসের এক নিবন্ধে মুজাহিদদের কাছে পরাজয়ের খবর স্বীকার করে বলা হয় যে, অধিকৃত কাশ্মিরে তিনজন জেনারেল সহ হাজার হাজার সৈন্য

নিহত হয়েছে। সরকারী সৈন্যরা সাজোয়া গাড়ী ছাড়া রাস্তায় বের হতে ভয় পায়। কয়েক স্থানে মাইন বিস্ফোরণে সৈন্যে ভর্তি সাজোয়া গাড়ীও ধ্বংস হয়েছে।

১৯৯৩ সনের প্রথম দিকে ৩০০ ব্যাটালিয়ান ভারতীয় সৈন্য কাশ্মীরে নিয়োজিত ছিল। তাতে তাদের সংখ্যা চার লাখের বেশী হয়। বর্তমান খবর অনুযায়ী সৈন্য সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৬ ডিভিসনে পৌছেছে। হিসাব অনুযায়ী কম করে হলেও ছয়লাখ সৈন্য কাশ্মিরের লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে। এত বিপুল সংখ্যক সৈন্যর উপস্থিতিতেও মুজাহিদদের বিজয় অব্যাহত রয়েছে।

মাইন বিস্ফোরণ

১২ই জুন কাশ্মিরের দক্ষিণ অঞ্চলের গুনডারবিছ নামক স্থানে জাতীয় সড়কের ওপর এক মাইন বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণে এক সৈন্যবাহী বাস ধ্বংস হয় ও তাতে আগুন লেগে যায়। বাসের আরোহী চল্লিশজন সৈন্য নিহত হয় বলে সরকারী তথ্য বিবরণীতে জানা যায়। এই বিস্ফোরণের পর জাতীয় মহা সড়ক ছয় ঘন্টা বন্ধ থাকে এবং প্রতিশোধ পরায়ন ভাতরীয় সৈন্যরা আশে পাশের গ্রামবাসীদের ওপর নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে। যার ফলে কয়েক ডজন গ্রামবাসী হতাহত হয়। ২২শে জুন মুজাহিদরা শ্রীনগর সেক্রেটারীয়েট ভবনে রকেট হামলা চালায়। যার ফলে কয়েকজন সরকারী কর্মচারী আহত হয়েছে বলে সরকারী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

অধিকৃত কাশ্মিরের শিখ সৈন্যরা পালিয়ে মুজাহিদের সাথে মিলিত হচ্ছে

ভারতীয় সৈন্যদের শিখ রেজিমেন্টের হাবিলদার রমেশ সিং অস্ত্রসহ মুজাহিদদের সাথে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী কাশ্মিরে অবস্থানরত সৈন্যদের অবস্থা অত্যন্ত খারাব। তাদের ছুটি দেয়া হয় না এবং ভাল খাদ্যও সরবরাহকরা হয় না। অফিসাররা আমাদের এই বলে পাঠিয়েছিল যে, সেখানে নির্বাচন হবে। কিন্তু সেখানে তো রীতিমত যুদ্ধ চলছে। এজন্য অফিসার ও সৈন্যদের সব সময় মতবিরোধ লেগে আছে। সে মুজাহিদদের সাথে মিলিত হয়ে ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

মুজাহিদ সাব্বির শাহ উনিশ বছর ধরে জেলে বন্দী আছেন

১৮ই জুন থেকে ২৩শে জুন পর্যন্ত সমগ্র কাশ্মিরে যে সকল কাশ্মিরী মুসলমান ভারতে বন্দী রয়েছে তাদের স্মরণে "জিন্দান" সপ্তাহ পালন করা হয়। ১৮ই জুন পিপলস লীগের নেতা সাব্বির শাহের বন্দী জীবনের উনিশ বছর পূর্ণ হয়। ৩৯ বছরের সাব্বির শাহ আজাদী আন্দোলনের অকুতভয় নেতা। উনিশ বছরে ভারতীয় সরকার এই দৃঢ়চেতা আপোষহীন নেতাকে স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিরত রাখার জন্য সর্ব প্রকারের চেষ্টা চালায়। বড় রকমের পদ, ভয়, লোভ ও নানা রকমের ফন্দি ফিকির করেও শাব্বির শাহের মাথা নিচু করাতে পারেনি।

কাশ্মির ফ্রিডম মুভমেন্টের সুপ্রিম কমাণ্ডারের ইন্তেকাল

৬ই জুন ইসলামাবাদ, কাশ্মির ফ্রিডম মুভমেন্টের সুপ্রিম কমাণ্ডার সাইয়েদ আব্দুল হামিদ দেওয়ান গত ৪ঠা জুন শুক্রবার পাকিস্তানের গুজরাট শহরের মুহাজির কাশ্মিরীদের আয়োজিত এক জনসভায় ভাষন দান শেষে লাহোর ফেরার পথে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ---- রাজিউন)

মরহুম আবদুল হামিদ দেওয়ান ১৯৩৬ সালে অধিকৃত কাশ্মিরের বারামুলা জিলার বান্ডিপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ কনে। তার পিতার নাম ছিল মৌলভী হেসাম উদ্দীন।

প্রাথমিক শিক্ষা নিজ ঘরে গ্রহণ করার পর তিনি বাবাগণ্ড নামক প্রাইমারী স্কুল ভর্তি হন। মেট্রিক পাশের পর আব্দুল হামিদ দেওয়ান শ্রীনগর কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে আই, এ, পাশ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য জম্মু ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করেন। এই সময় তিনি সমমনা ছাত্রদের নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম জোরদার করার লক্ষ্যে "ফ্রিডম ফাইটার ফর মাদার ল্যাণ্ড" নামক একটি যুব সংগঠন গঠন করেন।

ভারতীয় গোয়েন্দাদের কাছে এর খবর পৌছে যাওয়ায় তারা এর কার্যক্রম স্থগিত রাখে। জম্মু ইউনিভার্সিটি থেকে এম, এ, ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি সেনা বাহিনীতে ভর্তি হন। সেনা বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। প্রশিক্ষণ শেষ হতেই তিনি সৈন্য বিভাগ ছেড়ে আযাদী আন্দোলনে নেমে পড়েন।

১৯৬৮ স্বাধীনতাকামী কাশ্মিরী যুবকরা "আল ফাতাহ" নামক একটি গোপন সংগঠন গড়ে তুলে। দেওয়ানী সাহেব এই দলের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। ভাতরীয় গোয়েন্দ সংস্থা 'র' এই সংগঠনের কার্য্যকলাপে ভীত হয়ে এর ১২শ নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার কৃতদের মধ্যে দেওয়ানী সাহেবও ছিলেন। এ সময় তিনি এক বছর তিন মাস বন্দী ছিলেন। (সর্বমোট তিনি জীবনে দশ বছর জেল খাটেন। পাকিস্তানে যে সময় জেলে অন্তরীণ ছিলেন তা এ হিসাবে ধরা হয় নি)

জেল থেকে বের হয়ে তিনি পুরানো সাথীদের একত্রিত করে বিমান হাইজ্যাকের পরিকল্পনা নেন। মূলতঃ বিশ্ব বাসীর কাঝে কাশ্মিরবাসীদের ওপর ভারতীয় নির্যাতনের খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই ঝুকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়ে ছিলেন।

১৯৭৬ সনে রমজান মাসে ছয়জন নির্বাচিত সাথীসহ বোয়িং ৭৩৮ বিমান হাইজ্যাক করেন। প্রথমে তিনি এই বিমান নিয়ে লিবিয়া যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জ্বালানী শেষহয়ে যাওয়ায় লাহোর অবতরণ করতে বাধ্য হন। পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো তাকে ধোকা দিয়ে বিমান থেকে নামিয়ে জেলে পুড়ে রাখেন। জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি মুক্তি পান। পাকিস্তানের জেল সম্পর্কে তিনি এক মজার তথ্য দিয়েছেন। বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি জেলের দেয়ালে কাশ্মিরী স্বাধীনতা ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর মোনাফেকির ওপর কবিতা লিখে রেখেছিলেন। জেনারেল জিয়াউল হক তাকে মুক্তি দিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে সেই একই সেলে বন্দী রাখেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ১৯৭৮ সনে কাশ্মিরে ফ্রিডম মুভমেন্ট গঠন করেন। এই দলের সুপ্রিম কমাণ্ডারের দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত করা হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।

এই সময় আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। এই বীর মুজাহিদ আফগানিস্থানে উরগুন সেক্টরে মওলানা আরসালান রহমানীর নেতৃত্বে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া খোস্ত সেক্টরেও তিনি জিহাদে অংশ নিয়েছেন।

জিহাদে কাশ্মিরে তার অবদান চীর স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৭৩ সনে বিমান ছিনতাইর পর সুদীর্ঘ আঠারো বছর তিনি নিজ পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি যখন দেশ ত্যাগ করেন তখন তার একমাত্র পুত্রের বয়স আট মাস। ১৯৯০ সনে খবর আসে তার পুত্র জাহাজীব শহীদ হয়েছে। তিনি শুনে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ বেটা বাপের থেকে শাহাদাতে অগ্রগামী হল। (পরে খবর পাওয়া গেছে, তথ্য সঠিক ছিল না। তার ছেলে এখনও বেঁচে আছে)।

বসনিয়ায় মুসলিম বাহিনীর অব্যাহত বিজয়

বসনিয়ার মুজাহিদরা ক্রমাগত বিজয় অর্জন করে চলছে। গত জুন ও জুলাই মাস ছিল মুজাহিদদের বিজয়ের মাস। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মুজাহিদরা মধ্য বসনিয়ার ট্রাভলিক শহর দখল করে নেয়। শক্তিশালী ক্রোট বাহিনীকে পরাজিত করে। এসময় প্রায় এক হাজার ক্রোট মিলিশিয়া আত্ম সমর্পণ করে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে মুসলিম মুজাহিদরা আর এক সফল আক্রমণ চালিয়ে মধ্য বসনীয় জিপসী শহর দখল করে নেয়। এসময় ৪০ হাজার ক্রোট শহর থেকে পালিয়ে যায়। ৪০ জন ক্রোট সৈন্য এ হামলায় নিহত হয়। জুনের ১৭/১৮ তারিখে তারা ক্রোটদের নিকট থেকে মধ্যাঞ্চলীয় শহর কাকাঞ্চা এবং গত ১৭ই জুলাই মুজাহিদরা বিশ দিন যাবৎ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে সার্ব ও ক্রোটদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে দখল করে নেয় ফেজালিকা শহর। জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার ফলে বসনিয়ার মুজাহিদরা এক প্রকার নিরস্ত্র একটা বাহিনী। এর পরও তারা সুসংহত হয়ে যেভাবে আক্রমণ অভিযান চালাচ্ছে তা রীতিমত খৃষ্ট সার্ব-ক্রোট এমনকি পাশ্চাত্যের সরকার গুলির মনেও বিস্ময় ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

বসনিয়ার জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আহবান

মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাণ্ড ইমাম শেখ আল হক-আলী জাদ আল হকের প্রতিনিধি শেখ জামাল কুতুব কায়রোতে হাজার হাজার মুসলমানের এক সমাবেশে গত ২৬শে জুন বিশ্ব মুসলিমকে বসনিয়ার জিহাদে অংশ গ্রহণ করার আহবান জানান। তিনি বক্তৃতায় বসনিয়ার জাতিসংঘের দ্বিমুখী নীতিরও কঠোর নিন্দা ও সমালোচনা করেন।

৫ কাশ্মিরীকে পুড়িয়ে হত্যা

গত ২৮শে জুন ভারতীয় আধা সামরিক বাহিনী অনন্তনাগ শহরে মুসলমানদের বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৫ জন মুসলমান শহীদ হন। রাজধানী শ্রীগরে এক ভূমি মাইন বিস্ফোরণ ঘটনায় ২ জন সীমান্তরক্ষী নিহত হয়।

মুমিন হিসেবেই
যখন আমি নিহত
হতে যাচ্ছি,
তখন কোন্ পার্শ্বে
শায়িত অবস্থায়
আমি প্রাণ দিচ্ছি,
সে চিন্তায়
আমি একবিন্দু
কাতর নই।
—খাব্বাব ইবনুল ইব্‌ত (রাঃ)।

ইউনিক টেইলার্স

৫০, বায়তুল মোকাররম, ২য় তলা, ঢাকা

অত্যাধুনিক ও
রুচিসম্মত ডিজাইনের
খাঁটি গিনি সোনার
অলংকার
প্রস্তুতকারক
ও বিক্রেতা

ইউনিক জুয়েলার্স

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

৪৩, বায়তুল মোকাররম (২য়তলা),
ঢাকা—১০০০ ফোন —২৪৩২৭৩

সহযোগী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইউনিক ওয়াচ

সর্বপ্রকার ঘড়ি বিক্রয় ও মেরামত করা হয়

৩১, বায়তুল মোকাররম (দোতলা), ঢাকা
ফোন ঃ ২৩২৬৮০ বাসা ঃ ৪১৮৩৭৯

ভেষজ চিকিৎসায় সুখী নিরাপত্তা জীবন লাভের জন্য

বঙ্গ হারবাল কমপ্লেক্স

বাংলাদেশে আমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভেষজ চিকিৎসার মাধ্যমে পুরুষ দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে খরচ ও সময়ে সাশ্রয়ী ব্যবস্থা করে থাকি। বঙ্গ হারবাল কমপ্লেক্স-এর অভিজ্ঞ চিকিৎসাবিদ ও যৌন বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন প্রকার গাছ-গাছড়ার রস এবং উদ্ভিদ, জড় এবং প্রাণী থেকে গবেষণা করে বিভিন্ন জারক রস প্রায় ১০০ প্রকার ওষুধের মাধ্যমে যৌন চিকিৎসা করে থাকেন।

১০০% নিশ্চয়তাসহ কি কি রোগের চিকিৎসা করি

ঘন ঘন প্রস্রাব ✪ স্বপ্নদোষ ✪ শরীর দুর্বল ✪ মাজা কোমরে ব্যাথা ✪ ধাতু দুর্বল্য ✪ প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া ✪ সিফিলিস ✪ গণরিয়া ✪ গ্যাষ্ট্রিক ✪ আলসার ✪ পুরাতন আমাশয় ✪ বদহজম ✪ বাত ব্যাধি ✪ অর্শ-ভগনদর ✪ মহিলাদের শ্বেত প্রদর ✪ রক্ত প্রদর ✪ অনিয়ম ঋতুস্রাব ✪ বাধক ✪ স্বাস্থ্যহানী ✪ তলপেটে কোমরে ব্যথা ✪ চেহারা ফ্যাকাসে ✪ হাত পা জ্বালা ✪ ঘুম না হওয়া ইত্যাদি রোগের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে চিকিৎসা করে থাকি। বিফলে মুল্য ফেরত দেয়া হয়।

যুবক ও বিবাহিত ভাইদের প্রতি কিছু কথা

যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। এছাড়া যৌন শক্তি বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু ভেষজ ঔষধ আবিষ্কার করেছি। যা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করে অনেক উপকার পেয়েছেন। যাদের যৌন শক্তি কম, যাদের বীর্য পাতলা, যাদের বীর্য তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায়, যাদের বীর্য দেরীতে বের হয়, যাদের বীর্য ঘন হয়, যাদের বীর্য পাতলা হয়, যাদের বীর্য ঘন হয়ে জমে থাকে, যাদের বীর্য পাতলা হয়ে জমে থাকে, যাদের বীর্য দেরীতে জমে, যাদের বীর্য তাড়াতাড়ি জমে, যাদের বীর্য পাতলা হয়ে জমে থাকে, যাদের বীর্য ঘন

ফারূকী ট্রাস্ট বাংলাদেশ
এর কর্মসূচী ও
সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দেশ ও মিল্লাতের এছলাহ ও খেদমতের মহান জযবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজ থেকে দু'বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের মহান খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এর পূণ্য নাম বিজড়িত এক খালেছ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ফারূকী ট্রাষ্ট বাংলাদেশ বর্তমানে তার সকল বিভাগে পূর্ণ উদ্যোগে তৎপরতা শুরু করার পদক্ষেপ নিয়েছে। জন্ম লগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সমাজ—কল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি লিফলেট প্রকাশ, আদর্শ মক্তব কায়েম ও বিভিন্ন মাদ্রাসা সমূহে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে আসছে। এখন নদওয়াতুল উলামা লখনৌ ও স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এদারাতুল মাআরিফের ন্যায় একটি উচ্চাঙ্গের গবেষণা একাডেমী ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্য জোরদার মেহনত করছে। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সকলের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

মহাসচীব
ফারূকী ট্রাষ্ট বাংলাদেশ
৭৮/১ ঢালকানগর লেন,
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

RG. DA. NO-1101 ◆ MONTHLY JAGO MUJAHID ◆ AUGUST 1993 ◆ PRICE TAKA-7

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সূতী, স্যানডাক্স,
নায়লন ও টারকিস মোজা প্রস্তুতকারক

Chand SOCKS

চান্দ হোসিয়ারী মিলস
৩০, শাখারী নগর লেন, ফরিদাবাদ, ঢাকা–১২০৪

আল-ফারুক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও তিতাস প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
২৩ যদুনাথ বসাক লেন (টিপু সুলতান রোড), ঢাকা হতে মুদ্রিত।